স্বদেশ ও সভ্যতা

(মধ্যযুগ)

Approved by the Board of Secondary Education West Bengal as a Text-Book of History for Class VII of all High & Junior High Schools of West Bengal and Tripura.
[Vide Notification No. T.B. No. VII/H/81/100 dated 8.1.81]

স্বদেশ ও সভ্যতা

[মধ্যযুগ]

[শিক্ষাপর্ষৎ নির্দেশিত মৌখিক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী সংযোজিত]

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

সৌমেন ভট্টাচার্য্য, বি. এ, বি. টি.
প্রধান শিক্ষক, হালতু হাই-স্কুল, কলিকাতা-৭৮
ও
পরিমার্জন-সহযোগিতায়
অনিলকুমার মিত্র, এম্. এ, বি টি.
ইতিহাসের শিক্ষক, সিটি-কলেজ স্কুল, কলিকাতা-৭৩

নববর্ণমালা
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩
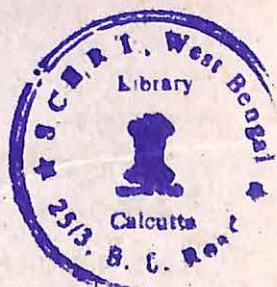
প্রকাশক ঃ
শ্রীনিত্যানন্দ সিকদার
নববর্ণমালা
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ—১৯৮০
পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৮১
তৃতীয় সংস্করণ—১৯৮৩
চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ—১৯৮৫

Price Rs. 12·00

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীপ্রবীরকুমার পান
লক্ষ্মী সরস্বতী প্রেস
২০৯ বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ সূচীপত্র ॥

॥ ১ ॥ মধ্যযুগের অর্থ ও স্থিতিকাল

মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাই হল ইতিহাস। ইতিহাসের এই ধারা অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলেছে। এর বৈশিষ্ট্যময় তারতম্যগুলি বুঝবার স্থবিধার জন্য ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করা হয়েছে।

নির্দিষ্ট কোন তারিখ থেকে কোন একটি যুগের সমাপ্তি ঘটে না বা কোন একটি যুগের সূচনাও হয় না। ঘটনাসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যই ইতিহাসবিদ্‌গণ একটি বিশেষ সময়কালকে কোন একটি যুগের সূচনা হিসেবে ধরে নিয়ে থাকেন। এই হিসেবে বিস্মৃতপ্রায় অতীতকাল থেকে সংঘটিত কাহিনীগুলির ধারাবাহিক বিবরণীগুলিকে ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—এই তিন-যুগে ভাগ করেছেন।

আমাদের বর্তমান পাঠ্যসূচী অনুযায়ী আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মধ্যযুগীয় ইতিহাস। স্থতরাং মধ্যযুগ বলতে কোন্ সময়কালকে বুঝতে হবে, পৃথিবীর সবদেশে একই সময়ে একইভাবে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল কি না, পৃথিবীর ইতিহাসে মধ্যযুগ কতদিন স্থায়ী হয়েছিল, মধ্যযুগের তাৎপর্যই বা কি—এইসব বিষয়ে আমাদের স্থস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

মধ্যযুগের সূচনা ও স্থিতিকাল ঃ মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, প্রাচীন যুগের সমাপ্তি ও বর্তমান কালের আরম্ভ—এরই মাঝামাঝি সময়কে মধ্যযুগ বলা হয়। সাধারণতঃ ঐতিহাসিকগণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে মধ্যযুগ আখ্যা দিয়েছেন, অর্থাৎ এই যুগের স্থিতিকাল ছিল প্রায় এক হাজার বছর। এঁদের মতে মধ্যযুগের স্থচনাকাল হিসেবে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সীমারেখা। এই বছরই বর্বর জার্মান জাতিগণ রোমান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেয় এবং ছয়টি

টিউটনিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ফলে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্যবন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, পুরানো সমাজ-ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে দেখা

দেয় অমার্জিত ভাবধারা। অজ্ঞানতার অন্ধকার সারা দেশকে ছেয়ে ফেলে। রোমান সাম্রাজ্যের কৃষ্টি ও সভ্যতার অবসান হয়।

মোটামুটিভাবে এই সময়কাল থেকেই ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বর্বরজাতিসমূহের আক্রমণে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্ত ধ্বংস হয়ে গেলেও পূর্ব-প্রান্তে এর অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল আরও প্রায় এক হাজার বছর। এর নাম ছিল পূর্ব রোমান বা বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। প্রাচীন গ্রীসের বাইজানটাইন শহরে ছিল এর রাজধানী। রোমান সম্রাট কনস্টানটাইনের নাম অনুসারে এর নাম হয়েছিল কনস্টান্টিনোপল। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের আক্রমণে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের অবসান হয়। আবার অনেকের মতে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর মধ্যযুগ শেষ হয়। যা হোক, পঞ্চম শতকের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত এই এক হাজার বৎসরের ঘটনাবলীকে ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত করেছেন।

মধ্যযুগের তাৎপর্য : মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করেই ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগ নামক কালপর্বটি স্থির করেছেন। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর দলে দলে রোমান ও গ্রীক পণ্ডিত ও মনীষীগণ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। নতুন সমাজ, নতুন রাষ্ট্র, নতুন শিল্প, নতুন জীবনযাত্রাপদ্ধতির জয়যাত্রা এই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। এই বছরটি তাই চিহ্নিত করা হয়েছে নবজাগরণ আন্দোলনের সূচনালগ্ন হিসাবে। এই সময় থেকেই ইতিহাসের আধুনিক যুগের সূত্রপাত। সুতরাং প্রাচীন যুগের অবসান থেকে এই প্রাক্-নবজাগৃতির মধ্যবর্তী সময়পর্বকে ঐতিহাসিকেরা চিহ্নিত করেছেন মধ্যযুগ রূপে।

অতএব, ইউরোপের ইতিহাসে 'মধ্যযুগ' বলতে মোটামুটিভাবে হাজার বছর সময়কালকে (৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) বুঝায়।

ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সূচনা : সাধারণভাবে পঞ্চম শতকের মধ্যভাগ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ সময়কালকে ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সূচনাকাল রূপে অভিহিত করা হয়। এই সময় ভারতে গুপ্ত রাজারা রাজত্ব করতেন। বর্বর হুণ জাতির পুনঃপুনঃ আক্রমণে বিশাল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে থাকে। ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়ে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে ; এর মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট রাজ্যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই সামন্তপ্রথার উদ্ভব হয়েছিল। এই সময় থেকে মোটামুটি পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সময়কালকে ভারতবর্ষে মধ্যযুগ বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

কি ইউরোপে, কি ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সূত্রপাত খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে এবং স্থিতিকাল পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় নানা লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়।

যুগসীমা পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা : একটি নির্দিষ্ট যুগের গতি ও প্রকৃতি বুঝবার জন্য ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগ কথাটি ব্যবহার করেছেন। একথা সত্য যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে সে যুগের মানুষ মধ্যযুগ আখ্যা দেন নি। এই সময়ের জনগণের কাছে তাদের যুগটি ছিল আধুনিক যুগ। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক যুগসমূহের বিবর্তন হয় ক্রমান্বয়ে, অত্যন্ত ধীর গতিতে। এটি ক্রমান্বয়ে ঘটে চলে নানা ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়ে। ঐতিহাসিক যুগগুলিকে কোন-কালের মাপা গণ্ডিতে বেঁধে রাখা যায় না। সুতরাং পরিবর্তনের ধারায় নতুন ও পুরানো উপাদান বহুকাল পর্যন্ত একত্রে মিলেমিশে থাকে। আবার কালের ধারায় নতুনের অগ্রগতির ফলে পুরানোকালের রেশ ধীরে ধীরে লীন হয়ে যায়। এই প্রাচীন যুগ নানা দিক দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল এক সময় মধ্যযুগের ঘটনাস্রোতে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে মধ্যযুগের বিকাশ : ঐতিহাসিকগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়কালকে মধ্যযুগের

বিকাশরূপে চিহ্নিত করেছেন। ইউরোপে এই যুগটি স্থায়ী হয়েছিল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষ থেকে পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত। এই সময়ে ইউরোপে রাজতন্ত্র ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং রোমান চার্চ সমগ্র খ্রীষ্টান জগৎকে এক ধর্মীয় ঐক্যবন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী মধ্যযুগে খ্যাতি ও শক্তির চরম শিখরে উঠেছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে ইউরোপে ফ্রাঙ্ক নরপতিগণ, নবম শতাব্দীতে ভারতে গুর্জর-প্রতিহারগণ, চতুর্দশ শতাব্দীতে চীনের মিং শাসকগণ খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। মধ্যযুগীয় ভারতে আলাউদ্দীন খলজী, আকবর ও আওরঙ্গজেব প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন।

ইতিহাসের অসম ধারা ঃ পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ইউরোপে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্যযুগ বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সূচনা হলেও পৃথিবীর দেশে দেশে কিন্তু একই সময়ে, একই বাস্তব পরিবেশে মধ্যযুগ বিকশিত হয় নি। নানাদেশে নানাভাবে মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়েছিল। তাই বিচিত্র সব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে আছে মধ্যযুগ পৃথিবীর দেশে দেশে। তবু ইউরোপে মধ্যযুগীয় সভ্যতার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ থেকে ভারতবর্ষেও মধ্যযুগের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা যায়।

॥ অনুশীলনী ॥

১। **সংক্ষিপ্ত উত্তরীভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) ইতিহাসকে সাধারণতঃ কয়টি যুগে ভাগ করা হয় ? কি কি ?

(খ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমী রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ?

(গ) পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের অন্য নাম কি ছিল ?

(ঘ) বাইজানটাইন শহরের নাম কনস্টান্টিনোপল হয়েছিল কেন ?

(ঙ) ইউরোপের ইতিহাসে কত খ্রীষ্টাব্দ থেকে কত খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ স্থায়ী হয়েছিল ?

(চ) ভারতবর্ষে মধ্যযুগ কখন থেকে শুরু হয় ?

(ছ) পৃথিবীর সব দেশে কি একই সময়ে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল ?

২। **রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ**

(ক) মধ্যযুগ কথার অর্থ ও তাৎপর্য কি ? ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে কি বোঝায় সংক্ষেপে লেখ।

(খ) ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

(গ) পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের কবে ও কি ভাবে পতন ঘটে ?

(ঘ) ঐতিহাসিক যুগ-পরিবর্তনের ধারা কি ভাবে ঘটে ?

৩। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

[এক] নিচের বাক্যগুলি থেকে অশুদ্ধ কথা কেটে দাও ঃ

(ক) কনস্টাণ্টিনোপল নাম হয় দরায়ুস / কনস্টানটাইন / আলেকজাণ্ডারের নাম অনুসারে।

(খ) রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত ধ্বংস হয়ে গেলেও পূর্ব প্রান্তে / উত্তর প্রান্তে / দক্ষিণ প্রান্তে এর অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল আরও এক হাজার বছর।

(গ) হূণ আক্রমণ / শক আক্রমণ / গথ আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়।

(ঘ) মধ্যযুগের অবসানকালে হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ / ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে।

(ঘ) প্রাচীন গ্রীসের / ইতালির বাইজানটাইন শহর ছিল পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ;

৪। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) ইতিহাস কি ?

(খ) ইতিহাসকে কয়টি যুগে ভাগ করা হয়েছে ?

(গ) ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কি ?

(ঘ) ইউরোপের ইতিহাসে কখন থেকে মধ্যযুগের সূচনা হয় ?

(ঙ) পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল ?

(চ) পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের কবে, কি ভাবে পতন ঘটে ?

———

॥ ২ ॥ পশ্চিমে মধ্যযুগ

যে-সব বর্বর জাতি-উপজাতিদের আক্রমণের পর আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হয়েছিল তাদের মধ্যে ভ্যাণ্ডাল, গথ ও হুণরাই ছিল প্রধান। এই সব বর্বর জাতির লোকেরা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ক্রমাগত দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে সদলে বসবাস করবার জন্য রোমান সাম্রাজ্যে অভিযান করেছিল। এই অভিযান প্রথমে শুরু করেছিল হুণ উপজাতির লোকেরা।

হুণদের আগমন : হুণরা ছিল মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর এক ধরনের যাযাবর জাতি। এই সব মঙ্গোলজাতীয় মানুষ ছিল পীতবর্ণ, প্রচণ্ড কর্মঠ ও সক্রিয়। পশুপালন ছিল এদের অন্যতম জীবিকা। মধ্য এশিয়ার স্তেপ ভূমি পরিত্যাগ করে এরা পশুচারণের উপযোগী জমির সন্ধানে কৃষ্ণসাগরের তীরে চলে আসতে শুরু করে। হুণদের এই পশ্চিম ও দক্ষিণমুখী অভিযান শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে।

হুণ আক্রমণ ও জার্মান উপজাতিদের স্থানান্তরে গমন : যাযাবর হুণদের তীব্র আক্রমণ প্রথমেই প্রতিরোধ করতে হয়েছিল অষ্ট্রোগথ নামক উপজাতি লোকদের। হুণদের কোথাও পরাজিত করে, আবার কোন কোন সময় অষ্ট্রোগথরা হুণ আক্রমণের ভয়ে অন্যত্র পলায়ন করে। অষ্ট্রোগথদের বাসস্থান তথা উপনিবেশগুলি হুণরা এইভাবে একের পর এক অধিকার করতে লাগল। অতঃপর হুণরা উপস্থিত হল কৃষ্ণসাগরের উত্তরাঞ্চলে। হুণরা জার্মান জাতিগুলির কাছ থেকে নিয়মিত কর আদায় করত।

হুণদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভ্যাণ্ডাল, গথ, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি উপজাতিরা ধীরে ধীরে রোমান সাম্রাজ্যের বাইরে মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপে বসতি গড়ে তোলে। সাধারণভাবে এরাই জার্মান উপজাতি নামে পরিচিত। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে রোমান সাম্রাজ্যর উত্তর, উত্তর-পূর্ব

ও পশ্চিম সীমান্তে প্রসারিত ছিল দানিয়ুব ও রাইন নদীর তীর পর্যন্ত। জার্মান উপজাতিরা বাস করত সীমান্তের ওপারে। তৃতীয় শতকে রোমান সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে রাইন সীমান্তে ফ্রাঙ্ক ও অন্যান্য জার্মান উপজাতিগণ, উত্তর হাঙ্গেরীতে ভ্যাণ্ডাল এবং ডাচিয়া অঞ্চলে পশ্চিমী গথ বা ভিসিগথরা অশান্তির সৃষ্টি করে। এদের পিছনে দক্ষিণ রাশিয়ায় ছিল অষ্ট্রোগথরা, অষ্ট্রোগথদের পিছনে ছিল দুর্ধর্ষ হুণ উপজাতি। হুণরা অন্যান্য উপজাতিদের কাছ থেকে কর আদায় করত, লুটতরাজ চালাত আর ক্রমে পশ্চিমে সরে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করত।

জার্মান উপজাতিদের রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমে বসতি স্থাপন : বর্বর উপজাতিদের মধ্যে প্রথমেই ভিসিগথরা রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ডাচিয়া অঞ্চলে (বর্তমানে রোমানিয়া) বসতি স্থাপনে প্রয়াসী হয়। কিছুকাল পরে ভ্যাণ্ডাল উপজাতিরা গথ উপজাতিদের চাপে অতিষ্ঠ হয়ে রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে বসবাসের জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সম্রাটের অনুমতিক্রমে শেষ পর্যন্ত তারা প্যান্নোনিয়ায় (হাঙ্গেরী) দানিয়ুব নদীর পশ্চিম তীরে বসবাসের অনুমতি লাভ করে। এই অনুমতি ছিল শর্তসাপেক্ষ। শর্তগুলির মধ্যে প্রধান ছিল ভ্যাণ্ডালরা সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তিপূর্ণ-ভাবে বসবাস করবে এবং রোমান সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে। ভ্যাণ্ডাল যোদ্ধারা এই শর্ত পুরাপুরি না মানায় রোমান শাসকরা ভ্যাণ্ডালদের উপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ভ্যাণ্ডালদের অনুসরণ করে ভিসিগথরাও হুণ আক্রমণ হতে পরিত্রাণ লাভের আশায় রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে বসবাসের জন্য রোমান সম্রাট ভ্যালেন্সের অনুমতি প্রার্থনা করে। সম্রাটের অনুমতিক্রমে তারা শেষ পর্যন্ত দানিয়ুব নদীর অপর তীরে বর্তমান বুলগেরিয়া অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে।

রোমান সম্রাট থিয়োডোসিয়াস ছিলেন সুদক্ষ শাসক। ভ্যাণ্ডাল ও গথ উপজাতিরা সম্রাটের আনুগত্য মেনে চললেও রোমান প্রশাসক ও সেনাপতিদের অত্যাচারে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। রোমানরা এদের

স্ত্রী-পুত্রদের ধরে নিয়ে দাস হিসেবে বিক্রয় করত। সময় সময় এদের খাদ্যের যোগান বন্ধ করে দিত, এমন কি এদের উপর দৈহিক নির্যাতনও

করা হত। কোন সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ভ্যাণ্ডাল ও গথ উপজাতির লোকেরা অনাহারে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হত। এইরূপ নির্যাতনে

অতিষ্ঠ হয়ে একবার ভ্যাণ্ডাল ও গথ উপজাতিরা রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু সম্রাট থিয়োডোসিয়াস কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

ভিসিগথ নেতা অ্যালারিক ঃ রোম সম্রাট থিয়োডোসিয়ামের মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকার নিয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব শুরু হয়। ফলে রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম অংশে ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের নাম হয় **বাইজানটাইন**। এর রাজধানী স্থাপিত হয় কনস্ট্যান্টিনোপলে, আর পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল রোমে। থিয়োডোসিয়াসের দুই পুত্রের মধ্যে হনোরিয়াস ভ্যাণ্ডাল উপজাতি সর্দার স্টিলিচো-র সহায়তায় রোমের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। স্টিলিচো ছিলেন ইতালি ও প্যান্নোনিয়ার সেনাবাহিনীর সর্বময় কর্তা। থিয়োডোসিয়াসের অপর পুত্র **আর্কাডিয়াস** ভিসিগথ উপজাতিদের সাহায্যে কনস্ট্যান্টিনোপলের সিংহাসন অধিকার করলেন। আর্কাডিয়াস নামেমাত্র রাজা ছিলেন। প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী হলেন ভিসিগথ নেতা **অ্যালারিক**। অ্যালারিক যেমন ছিলেন দুর্ধর্ষ, তেমনি ছিলেন বিচক্ষণ এবং ভিসিগথদের খুবই আস্থাভাজন।

দূরদর্শী অ্যালারিক রোমান সাম্রাজ্যের দুই অংশের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অবিলম্বে রোম আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি বিপুল সৈন্যসহ অগ্রসর হয়ে রোম নগরী অবরোধ করলেন। পাঁচিলঘেরা রোম শহরের নির্যাতিত ক্রীতদাসরা অ্যালারিককে স্বাগত জানিয়ে শহরের প্রধান ফটকগুলি উন্মুক্ত করে দিল এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দলবদ্ধভাবে অ্যালারিকের বাহিনীকে সাহায্য করল। অ্যালারিক রোম অধিকার করলেন (২৪শে আগস্ট, ৪১০ খ্রীঃ)। রোমে প্রতিষ্ঠিত হল বর্বর উপজাতিদের কর্তৃত্ব। ৪১১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ইতালিতে জ্বররোগে আক্রান্ত হয়ে অ্যালারিকের মৃত্যু হয়।

অ্যালারিকের রোম অধিকারের প্রতিক্রিয়া অনতিকাল মধ্যে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্র দেখা দিল। শুরু হল যেখানে-

সেখানে বর্বর উপজাতিদের নৃশংস আক্রমণ। ফলে রোমান এলাকার মধ্যে বর্বর উপজাতিদের ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠতে লাগল, আর চলতে লাগল অবাধ লুটতরাজ। জার্মান উপজাতিদের এই অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটানো এবং নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

ভ্যাণ্ডাল নেতা গেইসেরিক: অ্যালারিক যেমন ছিলেন ভিসিগথদের নেতা, গেইসেরিকও তেমনি ছিলেন ভ্যাণ্ডালদের নেতা। গেইসেরিক ছিলেন অসাধারণ সাহসী ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। রোমান সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করার কাজে গেইসেরিকের ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। প্যান্নোনিয়া নামক স্থানে ভ্যাণ্ডালগণ গড়ে তুলেছিল তাদের উপনিবেশ। একাজেও গেইসেরিকের কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক। ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে গেইসেরিকের নেতৃত্বে ভ্যাণ্ডাল বাহিনী রোম ও জার্মানীর মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে স্পেনে উপস্থিত হয়। এখানে ভিসিগথ ও অন্যান্য জার্মান উপজাতিরা বিভিন্ন রাজ্য গড়ে তুলেছিল। ৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই জার্মান উপজাতিরা সম্মিলিতভাবে আফ্রিকা অভিযান করে। নানা জায়গা অধিকার করার পর ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যাণ্ডালগণ গেইসেরিকের নেতৃত্বে রোম নগরী দখল ও লুণ্ঠন করল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ভিসিগথ সর্দার অ্যালরিকের আক্রমণে বিধ্বস্ত রোম নগরীর যে-টুকু অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, গেইসেরিকের আক্রমণে তাও শেষ হয়ে গেল।

রোমনগরী লুণ্ঠনের অর্থ দ্বারা গেইসেরিক তাঁর অনুগামীদের জন্য এক সুন্দর রাজপ্রাসাদ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রূপায়িত করেন। মৃত্যুকালে এই আজীবন-যোদ্ধা একটি শক্তিশালী নৌ-বহর রেখে যান। উপরন্তু তিনি রেখে যান প্রচুর মণিমাণিক্যপূর্ণ একটি রাজ-কোষাগার। ইতিহাসে গেইসেরিক ভ্যাণ্ডালদের রাজা বলেই পরিচিত।

হুণনেতা এটিলা: ইউরোপের ইতিহাসে পঞ্চম শতককে বলা হয় হুণদের শতক। এই শতকের মাঝামাঝিকালে হুণদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন এক যুদ্ধ-নায়ক। তাঁর নাম এটিলা। এটিলা কেবল

হূণদের সর্বময় কর্তাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ইউরোপ থেকে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর। দানিয়ুব নদীর পূর্ব প্রান্তে হাঙ্গেরীতে ছিল তাঁর প্রধান কেন্দ্র। চীনদেশের সঙ্গে তাঁর দূত বিনিময় হয়েছিল।

এটিলা বার বার আক্রমণ করে বাইজানটাইন সম্রাট থিয়োডোসিয়াসকে বিপন্ন করে তুলেছিলেন। এটিলার আক্রমণে কম-পক্ষে বলকান অঞ্চলের ৭০টি শহর নিশ্চিহ্ন হয়েছিল এবং নিহত হয়েছিল অগণিত মানুষ। সম্রাট থিয়োডোসিয়াস প্রতিবারই বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন দিয়ে এটিলার ধ্বংসলীলার হতে থেকে কনস্টান্টিনোপল রক্ষা করেছিলেন।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে এটিলা এই সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে মনস্থ করলেন। ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশাল বাহিনীসহ গল দেশ আক্রমণ করে উত্তরাংশের প্রায় সব শহর বিধ্বস্ত করলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে রোমান বাহিনী বর্বর ফ্রাঙ্ক ও ভিসিগথদের সঙ্গে মিলিতভাবে এটিলার গতিরোধ করতে অগ্রসর হল। এক ভয়াবহ যুদ্ধে প্রায় তিন লক্ষ লোক তাদের প্রাণের বিনিময়ে এটিলাকে প্রতিহত করল। এতেও কিন্তু এটিলা নিরস্ত হয়নি। পরের বছর বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে এটিলা উত্তর ইতালি অভিযান করলেন। তিনি সমৃদ্ধ মিলান শহর লুণ্ঠন করলেন এবং নির্বিচারে গণহত্যা করে নিষ্ঠুরতার নগ্ন ও সম্যক পরিচয় দিলেন। অনেকগুলি শহর অগ্নিসংযোগে ভস্মস্তূপে পরিণত করলেন। পাডুয়া, মিলান প্রভৃতি শহর থেকে ধনী ব্যক্তিরা পালিয়ে এসে আড্রিয়াটিক সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন এবং পত্তন হল মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ নগরী ভেনিসের।

রোমান ও জার্মান জাতির পরম শত্রু এটিলা ছিলেন যেমন স্বভাবে ক্রূর তেমনি দেখতেও ছিলেন অত্যন্ত কদাকার। তাঁকে কেউ কেউ মনে করতেন 'বিধাতার চাবুক'। এমন নির্মম, এমন ভয়ংকর মানুষ পৃথিবীতে খুবই বিরল। তাঁকে প্রতিহত করার মত কোন শক্তি

রোমানদের ছিল না। তাঁর একটি জাঁকজমকপূর্ণ রাজদরবার ছিল। একথা খুবই সত্য যে এটিলা ছিলেন হুণদের শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি।

রোমান সাম্রাজ্যে বর্বরদের যতগুলি আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল হুণ আক্রমণের তীব্রতা, নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংসলীলার কাছে যে-সবগুলি ম্লান হয়ে যায়। ভ্যাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি জার্মান উপজাতিরা বর্বর হলেও

হুণনেতা এটিলা

দীর্ঘদিন রোমানদের সঙ্গে সহ-অবস্থানের ফলে তাদের আচার-আচরণে অনেক রোমান প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল এবং তারা বহুলাংশে সভ্য হয়ে উঠেছিল। সাধারণভাবে তাদের বর্বর আখ্যা দিলেও তারা উন্নত ও সভ্য ভাবধারার পরিচয় দিয়েছিল। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল রাজশক্তি ও অভিজাতরা—সাধারণ মানুষ নয়। কিন্তু মঙ্গোলীয় হুণরা এমনিতে ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতির, তদুপরি ইউরোপীয় মানুষ ও সভ্যতার সঙ্গে কোন যোগ না থাকায় তাদের আচরণে অমানুষিকতা ও নিষ্ঠুরতাই প্রকট হয়ে উঠেছিল।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঃ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে অভিযানের পর এটিলা আর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না।

৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ এটিলার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হুণদের আধিপত্য খর্ব হতে থাকে। একথা অনস্বীকার্য যে, হুণ আক্রমণের তীব্র আঘাতে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হয়েছিল। এটিলার মৃত্যুর পরবর্তী বিশ বছরে ভ্যাণ্ডাল ও অন্যান্য বর্বর জাতির মধ্য থেকে একে একে দশজন রাজা রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অবশেষে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এক শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

জার্মান অনুপ্রবেশকারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়-জীবন ঃ রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান ঘটনা হল বিভিন্ন বর্বর জাতি-উপজাতিদের নানাদিক থেকে রোমান সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ। জার্মান জাতীয় এই অনুপ্রবেশকারীরা বাস করত প্রধানতঃ রোম সাম্রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত মধ্য ইউরোপের বিস্তীর্ণ অরণ্য ও জলাভূমিতে। এরা রোমানদের মত সুসভ্য ছিল না। এজন্য রোমানরা এদের বর্বর বলে অভিহিত করত।

জার্মানরা ছিল দীর্ঘকায় ও বলবান। ঈষৎ লাল চুল ও নীল চক্ষু ছিল এদের চেহারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাদের ভাষা ছিল সম্ভবতঃ প্রাচীন আর্য ভাষারই একটি শাখা ভাষা।

বাসস্থান ঃ রোমানরা শহরে থাকতে ভালবাসত। কিন্তু জার্মানরা বাস করত গ্রামে। শত্রুর আক্রমণ হতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে গ্রামগুলিকে ঘিরে দেওয়া হত শক্ত খুঁটি দিয়ে। কাঠের খুঁটি দিয়ে ঘরের কাঠামো তৈরী হত। খড় দিয়ে চাল ছাওয়া হত। দেওয়াল তৈরী হত মাটি দিয়ে। বাসগৃহের কাছেই গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে সার, খাদ্যশস্য ইত্যাদি মজুত রাখত।

জীবিকা ঃ জার্মান উপজাতিরা শিকার করে, মাছ ধরে ও পশু-পালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। কৃষিকাজে তাদের বিশেষ কোন উৎসাহ ছিল না। প্রাণধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য তারা কোন-মতে সংগ্রহ করত। একখণ্ড জমি সবাই মিলে চাষ করে সকলে তার ফসল ভাগ করে নিত। পরবর্তীকালে কৃষিই হয়ে দাঁড়ায় তাদের

প্রধান বৃত্তি। কাঠের তৈরী হাতিয়ার দিয়ে তারা চাষ করত। জমি নিয়ে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে কোন বিবাদ ছিল না। চাষের জমি ছাড়া, গোচারণভূমি, বন-প্রান্তর ছিল সর্বসাধারণের সম্পত্তি।

রাজনৈতিক জীবন ঃ জার্মানগণ তাদের শাসনকাজের সুবিধার জন্য অধিকৃত অঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিল। সর্বনিম্ন রাজনৈতিক বিভাগ ছিল গ্রাম। গ্রাম পরিচালনা করত কয়েকটি সভা। দশ-বিশটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত হানড্রেড। এই হানড্রেডগুলি পরিচালনার জন্যও নিজস্ব সমিতি থাকত। কয়েকটি হানড্রেড নিয়ে গঠিত হত কাউণ্টি। কতিপয় কাউন্টি নিয়ে গঠিত হত এক-একটি জাতীয় অঞ্চল। যখন জার্মানদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হল রাজতন্ত্র তখন এক-একটি জাতীয় অঞ্চল রেইখ বা রাজ্য নামে পরিচিত হল। এক-একটি জাতির স্বাধীন যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত হত জাতীয় সভা। সেখানে সমগ্র জাতির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হত। যে-বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন ছোট ছোট দলপতিগণ। •উপজাতিদের গোষ্ঠীজীবন শাসন করত নির্ধারিত প্রতিনিধিগণ।

ধর্মজীবন ঃ মধ্যযুগের জার্মান জাতির ধর্মাচরণের প্রধান অঙ্গ ছিল প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের প্রতীকরূপে, শিল্পকলার উদ্ভাবকরূপে এবং মানবজাতির প্রতিষ্ঠানসমূহের রক্ষকরূপে দেবতার উপাসনা। থর (বজ্রদেবতা) ছিলেন পৃথিবীর রক্ষক। ওডেন ছিলেন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ও কবিতার উদ্ভাবক। তাঁর স্ত্রী ফ্রিয়া ছিলেন স্বর্গের দেবী। তাদের সৌন্দর্যের দেবীর নাম ছিল ফ্রেগা। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পূর্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঐ যুগে জার্মানগণ পুরোহিতদের উপর নির্ভর করত। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় রকম পুরোহিত ছিল। বর্বর জাতির এই মানুষেরা শেষ পর্যন্ত রোমানদের কাছ থেকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। তারা কখনই রোমান ধর্মাধিষ্ঠানের উপর আঘাত হানেনি, বা তাকে বিপন্ন করে তোলেনি। বরং তার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ও রীতিনীতি-গুলি অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করেছিল।

উপজাতিদের উপর রোমানদের প্রভাব ঃ রোমান সাম্রাজ্যের পাশাপাশি বসবাসের ফলে বর্বর জার্মান উপজাতিদের সঙ্গে উন্নত রোমানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। রোমে খ্রীষ্টধর্ম সরকারীভাবে গৃহীত হওয়ার পর থেকে এটি সর্বসাধারণের ধর্ম হয়ে উঠে এবং এর প্রভাবে বর্বর উপজাতিদের জীবনধারারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একদিকে ল্যাটিন ভাষার প্রভাবে বর্বরদের প্রচলিত কথ্যভাষা যেমন রূপান্তরিত হয়, অন্যদিকে তেমনি খ্রীষ্টধর্ম ও রোমান সভ্যতার প্রভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। উভয়ের মধ্যে এই ভাবের আদান-প্রদান দীর্ঘদিন ধরে চলে। একথা বলা খুবই সঙ্গত যে, বর্বর উপজাতিরা বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হলেও রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তারা আপনায়িত করে নিয়ে ইউরোপের জাতি-গোষ্ঠি ও সমাজ গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

॥ অনুশীলনী ॥

১। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। হূণ উপজাতির লোকেরা কোথায়, কি ভাবে বাস করত ?
২। জার্মান উপজাতিগোষ্ঠী বলতে কাদের বুঝায় ?
৩। জার্মান উপজাতিরা রোমান সাম্রাজ্যে বসতি স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছিল কেন ?
৪। ভ্যাণ্ডাল উপজাতিরা কি শর্তে রোমান সাম্রাজ্যে বসবাসের অনুমতি লাভ করেছিল ? তারা সে শর্ত পালন করেছিল কি ?
৫। ভ্যাণ্ডাল ও গথ উপজাতির লোকদের সঙ্গে রোমান শাসকদের সম্পর্ক কেমন ছিল ?
৬। অ্যালারিক কিভাবে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের শাসনক্ষমতা হস্তগত করেছিলেন ?
৭। ভ্যাণ্ডলরা কোথায় তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল ?
৮। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন কখন হয়েছিল ?

২। **রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ**

১। হূণদের সঙ্গে জার্মান উপজাতির সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। জার্মান উপজাতিদের পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে বসতি বিস্তারের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩ অ্যালারিক কিভাবে রোমে বর্বর উপজাতিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?

৪। গেইসেরিকের রোম অভিযান আলোচনা কর।

৫। 'ইউরোপের ইতিহাসে পঞ্চম শতককে বলা হয় হূণদের শতক'।—এই প্রসঙ্গে হূণদের কার্যকলাপ আলোচনা কর।

৬। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লোপে হূণ নেতা এটিলার ভূমিকা আলোচনা কর।

৭। এটিলা দেখতে কেমন ছিলেন ? তাঁকে কি বলে অভিহিত করা হত ?

৮। জার্মান উপজাতিদের বাসস্থান ও জীবিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৯। জার্মান উপজাতিদের রাষ্ট্রব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১০। জার্মান উপজাতিদের ধর্মজীবন আলোচনা কর।

১১। উপজাতিদের উপর রোমান সভ্যতার প্রভাব তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৩। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

[এক] **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) ভিসিগথদের নেতা কে ছিলেন ?

(খ) ভ্যান্ডালদের নেতার নাম কি ?

(গ) অ্যালারিক কত খ্রীষ্টাব্দে রোম দখল করেন ?

(ঘ) টিউটনিক জাতি বলতে কাদের বুঝায় ?

[দুই] **সঠিক উত্তর নির্বাচন কর ঃ**

(ক) এটিলা ছিলেন ভ্যান্ডাল দলপতি / হূণ দলপতি / গথ দলপতি।

(খ) ভ্যান্ডালগণ রোম নগরী লুণ্ঠন করে ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে / ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে / ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে।

(গ) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনে ভিসিগথ নেতা অ্যালারিক / ভ্যান্ডাল নেতা গেইসিরিক / হূণনেতা এটিলার কৃতিত্ব সর্বাধিক।

৪। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) হূণদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল ?

(খ) রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে কোন বর্বর জাতি প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল ?

(গ) অ্যালারিক কে ছিলেন ?

(ঘ) গেইসেরিকের প্রকৃত পরিচয় কি ?

(ঙ) এটিলা কাদের নেতা ছিলেন ?

(চ) হূণদের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন ?

———

॥ ৩ ॥ ইউরোপে অন্ধকার যুগের স্বরূপ

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের সূচনাকাল থেকে পঞ্চম শতকের তৃতীয় পাদ সময়ের মধ্যে বর্বর ভ্যাণ্ডাল, গথ ও দুর্ধর্ষ হুণদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এই সময় থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও রোমান সাম্রাজ্যে দারুণ বিপর্যয়ের সূচনা দেখা দেয় এবং সারা ইউরোপ জুড়ে এই ধারারই রেশ চলে প্রায় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে ইউরোপের ইতিহাসে কোন বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক বা দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেনি। এমন কি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন অনুভূত হয়নি। এসব দিক বিচার করে ঐতিহাসিকগণ এই তিন-চারশ' বছর সময়কালকে 'অন্ধকার যুগ' বলে অভিহিত করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে অন্ধকার যুগ অন্ধকার ছিল নাঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত সময়কালকে অন্ধকার যুগ বলে ধরে নেওয়া মোটেই সঙ্গত নয়। ইতিহাস তখনও অব্যাহত ছিল— স্তব্ধ হয়ে যায়নি। কারণ জার্মান বিজয়ের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে যে-মতই পোষণ করুক না কেন, একথা খুবই সত্য যে জার্মানরা পশ্চিমী-সভ্যতা আদৌ ধ্বংস করে নি। চরম বর্বরতার মধ্য দিয়ে রোমান অঞ্চলে তারা তাদের রাজনৈতিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল বটে, কিন্তু রোমান সভ্যতার প্রতি তারা বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ছিল না। অধিকন্তু রোমানদের সংস্পর্শে এসে তাদের আচার-আচরণে, বেশ-ভূষায়, অস্ত্র-শস্ত্রে এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে অশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং তাদের পুরুষানুক্রমে আচরিত পৌত্তলিকতা ও বর্বর আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করেছিল। তাদের যে লিখিত সাহিত্য ছিল—গথিক বাইবেল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বহু গথ গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। প্রাচীন দার্শনিক প্লেটোর চিন্তাধারায় বিশ্বাসী অনেক খ্যাতিমান

দার্শনিক তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। জার্মানগণ তাদের শৌর্য-বীর্য অক্ষুণ্ণ রেখে পুরানো ধ্বংসস্তূপের উপর সভ্য, উন্নত নতুন শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। লুণ্ঠন-হত্যা-ধ্বংস ও তাণ্ডবের মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার মধ্যেও ইউরোপের মানুষ অপরিমেয় প্রাণশক্তি ও সৃজনশীল মন নিয়ে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল, নতুন সভ্যতার আলো জ্বেলেছিল। এসব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এই যুগকে অন্ধকার যুগ বলা পুরোপুরি যুক্তিসংগত নয়।

মঠ-মন্দিরে ধর্মনির্ভর শিক্ষা চর্চা : ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে রাজনৈতিক জীবনে যে অস্থিরতা ও অরাজকতা শুরু হয় তার প্রভাব পারিলক্ষিত হয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর। এই রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও খ্রীষ্টান মঠ ও ধর্মাধিষ্ঠানগুলি তাদের নিজস্ব বিদ্যাচর্চা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা চার্চ ও পাদ্রীদের উপর শিক্ষার এই একান্ত নির্ভরতা সামাজিক অগ্রগতি ও সভ্যতার মান উন্নয়নে আদৌ সহায়ক হয়নি। সে যুগের খ্রীষ্টভক্তদের ধারণা ছিল যে, পার্থিব কোন ব্যাপারে মানুষের করণীয় কিছুই নেই। মানব-পিতা ঈশ্বর তাঁর প্রিয় সন্তান যীশুর মাধ্যমে মানুষের মুক্তির জন্য যে-পথ নির্দেশ করেছেন, সেই পথে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ। ফলে যীশুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দর্শন ও নীতিশাস্ত্র আলোচনা করাই ছিল সে যুগের মানুষের একমাত্র কাম্য। এছাড়া জ্ঞান অর্জনের অন্য কোন পথ ছিল না। শিক্ষার ক্ষেত্রে চার্চ ও পাদ্রীদের ভূমিকা এবং অতি সংকীর্ণ ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীই চতুর্থ শতক থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত ইউরোপে শিক্ষায় আগ্রহী মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

সমাজজীবনের উপর ধর্মনির্ভর শিক্ষার ফল : রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসকারীদের মধ্যে ভ্যাণ্ডাল, গথ, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি বর্বর জাতি উপজাতিরা ছিল ইউরোপীয় পরিমণ্ডলের মানুষ। রোমানদের প্রচেষ্টায় যে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল মানসিক দিক থেকে তা গ্রহণ করতে বিজেতা বর্বরদের বিশেষ আপত্তি ছিল না। তাই বর্বর জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করে উন্নত ও সভ্য রোমান নাগরিকের আচার-

আচরণ গ্রহণ করে তাদের মোটামুটি রোমান হয়ে যাবার দিকে বিশেষ প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। এছাড়া তারা যেসব ছোট-বড় রাজ্য গড়ে তুলেছিল, উন্নত প্রশাসনের দিক দিয়ে সেখানে রোমান আইন, রোমান প্রশাসনের ধারা, ল্যাটিন ভাষার প্রচলন করতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে চার্চের জীবনধারাকে ক্ষুণ্ণ করা দূরে থাক, তারা নিজেরাই দ্রুত খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করল। এইভাবে সারা ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম প্রসার হওয়ায় রোমান চার্চের প্রাধান্যও বেড়ে যায় এবং ক্রমশঃ ধর্মাধিষ্ঠান হয়ে উঠে সমগ্র খ্রীষ্টান জনগণের ঐক্য, বিশ্বাস, নিয়মানুবর্তিতা ও সামাজিক বন্ধনের প্রতীক স্বরূপ। এই সময় রোমের প্রধান খ্রীষ্টভক্ত পুরোহিতরাই কালক্রমে সমগ্র খ্রীষ্টান সমাজের ধর্মগুরু পোপে রূপান্তরিত হলেন এবং তাঁরাই হয়ে দাঁড়ালেন খ্রীষ্টভক্ত ইউরোপের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। এই সময়ে পোপের আদেশ রোমান সম্রাটের আদেশের তুলনায় বেশী গুরুত্ব ও মর্যাদা পায়।

ভালমন্দ ধর্মীয় ধারণা ঃ পোপ এবং তার অনুগামীরা ছিলেন বহুলাংশে নির্যাতিত, অবহেলিত ও অত্যাচারিতের পক্ষে। জার্মান সমাজে তারা দয়াদাক্ষিণ্য ও বদান্যতার নীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল। যাজকগণ প্রায় সকলেই অত্যন্ত দয়ালু ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। কোনটি সঠিক এবং সদাচার, আর কোনটি সঠিক নয়, এ সম্পর্কে তারা যে ধারণা প্রচার করতেন জার্মান জনগণের কাছেও তার আবেদন ছিল অনস্বীকার্য। Regula Pastoralis নামক পুস্তকে জনগণের প্রতি যাজকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য-নির্ধারিত ছিল। সুতরাং জনগণের সঙ্গে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে যাজকগণ এই পুস্তিকার নির্দেশ মেনে চলতেন।

শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্ম-আইন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যাজকতন্ত্রের একটি নিজস্ব, নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকায় উন্নততর সভ্যতার এক বিরাট প্রভাব বহিরাগত বর্বর অনুপ্রবেশকারীদের সভ্যভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। গীর্জা থেকে প্রচারিত, মঠ থেকে উচ্চারিত ভাল আর মন্দের ধারণায় প্রভাবিত হয়েছিল তারা। নানা দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে সভ্যতার আলোকবর্তিকা এভাবেই অনির্বাণ ছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, তথাকথিত বর্বর জাতি-উপজাতির বিজেতা মানুষ নানাভাবে প্রাচীন রোমক সভ্যতার আলোয় আলোকিত হয়েছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে রোমান সংস্কৃতিকে তারা গ্রহণ করেছিল। তাদের বলায়, কথায়, চলায়, জীবনযাত্রায় তারা প্রাচীন রোমান পদ্ধতিকে একটি প্রভাবজনক শক্তিরূপে মেনে নিয়েছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতা ভেঙ্গে পড়েছিল সত্য, কিন্তু এই ভাঙ্গার মধ্যে সভ্যতার পরবর্তী বিকাশপর্বের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার না হলেও যুগটি যে মোটেই অন্ধকারময় ছিল না একথা সহজেই বলা যায়।

॥ অনুশীলনী ॥

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ইউরোপের ইতিহাসে কোন্ সময়কে অন্ধকার যুগ বলা হয় ?

২। এই সময়কে ঐতিহাসিকগণ অন্ধকার যুগ বলছেন কেন ?

৩। মধ্যযুগে শিক্ষাচর্চা কোথায় হত ?

৪। পোপ কে ছিলেন ? তাঁর ক্ষমতা কিরূপ ছিল ?

৫। Regula Pastoralis নামক পুস্তকে কি নির্ধারিত ছিল ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ইউরোপে অন্ধকার যুগ বলতে কি বুঝায় ? অন্ধকার যুগের প্রচলিত ধারণা কি ভাবে গড়ে উঠেছিল ?

২। ইতিহাসের বিচারে অন্ধকার যুগের ধারণা কি সত্য ? যদি না হয় তবে এ সম্পর্কে তোমার মতামত আলোচনা কর।

৩। অন্ধকার যুগে ধর্মনির্ভর শিক্ষাচর্চা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। সমাজ-জীবনের উপর ধর্মনির্ভর-শিক্ষার ফলাফল আলোচনা কর।

৫। অন্ধকার যুগে চার্চ ও পোপের ভূমিকা কি ছিল ?

৬। জনগণের উপর চার্চের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা কর।
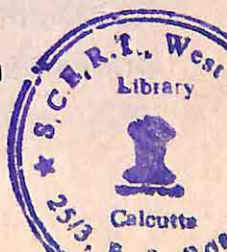
॥ ৪ ॥ বাইজানটাইন সভ্যতা

আধুনিক তুরস্কের অন্তর্গত কনস্টান্টিনোপল শহরকে কেন্দ্র করে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এর নাম বাইজানটাইন সভ্যতা। কনস্টান্টিনোপলের বর্তমান নাম **ইস্তাম্বুল**। অতীতে যখন এটি ছিল গ্রীক উপনিবেশ তখন এর নাম ছিল **বাইজানটিয়াম**। বর্বর জাতি-সমূহের আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম অংশে দ্বিধাবিভক্তি হয়ে পড়েছিল। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী রইল রোম, আর পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী হল বাইজানটিয়াম নগরী। এই নতুন রাজধানী স্থাপনের স্থান নির্বাচন করেছিলেন স্বয়ং রোমান সম্রাট **কনস্টানটাইন** ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁরই নামানুসারে এর নাম হয় কনস্টান্টিনোপল।

৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট ডায়োক্লেটিয়ানের সিংহাসনে ত্যাগের পর রোমে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধের অবসানে কনস্টানটাইন রোমের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে পড়লেন। তিনি ৩০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমের সম্রাট ছিলেন। বিচক্ষণ, দূরদর্শী এবং দৃঢ়চেতা শাসক হিসাবে তিনি ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ।

কনস্টান্টিনোপলে রাজধানী স্থাপনঃ ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী বাইজানটিয়ামে স্থানান্তরিত হয়। রোমান সম্রাট কনস্টানটাইনের নাম অনুসারে বাইজানটিয়ামের নূতন নাম হয় কনস্টান্টিনোপল। এই রাজধানী পরিবর্তনের পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ রোমান সাম্রাজ্য আয়তনে ছিল বিশাল, ফলে রোম থেকে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের উপর দৃষ্টি রাখা সবসময় সম্ভব হত না। দ্বিতীয়তঃ, কনস্টান্টিনোপল হতে সাম্রাজ্যরক্ষা খুবই সহজ ছিল। কনস্টান্টিনোপল থেকে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এবং এশিয়া ও ইউরোপের বাণিজ্য-পথের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা সহজ ছিল। তৃতীয়তঃ, নতুন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল হতে রোমের শত্রু

গথ ও পারসিকদের গতিবিধি লক্ষ্য করা সহজ ছিল। **চতুর্থতঃ,** সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানচর্চার অন্যতম পীঠস্থান গ্রীস এবং প্রাচ্য-মহাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য কনস্টান্টিনোপলে রাজধানী স্থাপন খুবই প্রয়োজন ছিল।

কৃষ্ণসাগরের নিকট ফসফরাস প্রণালীর উপকূলে স্থাপিত হয়েছিল কনস্টান্টিনোপল নগরী। বাণিজ্যিক সুবিধার দিক থেকে স্থানটি ছিল খুবই উপযুক্ত। তাই অল্পদিনের মধ্যেই কনস্টান্টিনোপল বৃহৎ বন্দরে পরিণত হয়েছিল। কনস্টান্টিনোপল শহরটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। এর চারদিক ছিল প্রাচীরঘেরা। শহরের মধ্যভাগে একটি মর্মর-স্তম্ভ ছিল—এতে লেখা ছিল এটি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল। পরবর্তীকালে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু সম্রাট কনস্টানটাইনের এই কীর্তি অব্যাহত থেকে গিয়েছিল।

খ্রীষ্টধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধর্ম ঃ রোমান সম্রাট অগস্টাসের রাজত্বকালে প্যালেস্টাইনের বেথলেহেম-এ যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তন করেন। খ্রীষ্টধর্ম ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করতে থাকায় যীশুর বিরোধীরা সম্রাট টাইবেরিয়াসের রাজত্বকালে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে। যীশুর অনুগামীদের মধ্যে ক্রীতদাস ও নিম্নশ্রেণীর নির্যাতিত মানুষই ছিল বেশি। রোমান দেব-দেবীর প্রতি খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস বা আস্থা ছিল না। তারা সম্রাটের কল্যাণে যাগযজ্ঞ করতে অসম্মত হয়। অথচ এই সময় রোমবাসীদের কাছে সম্রাট দেবতার ন্যায় বিবেচিত হতেন। সুতরাং রোমান সম্রাটদের উপর খ্রীষ্টান প্রজাদের এই অবজ্ঞার মাত্রা যতই বাড়তে লাগল, তাদের উপর ততই রাজকীয় নির্যাতনের মাত্রাও অব্যাহত গতিতে চলতে থাকল।

রোমান সম্রাটগণ খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেও সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে উদার মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী। তিনি যখন দেখলেন রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ খ্রীষ্টধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং খ্রীষ্টানদের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে, তখন বুদ্ধিমান

কনস্টানটাইন রাজনৈতিক প্রয়োজনে খ্রীষ্টানদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন।
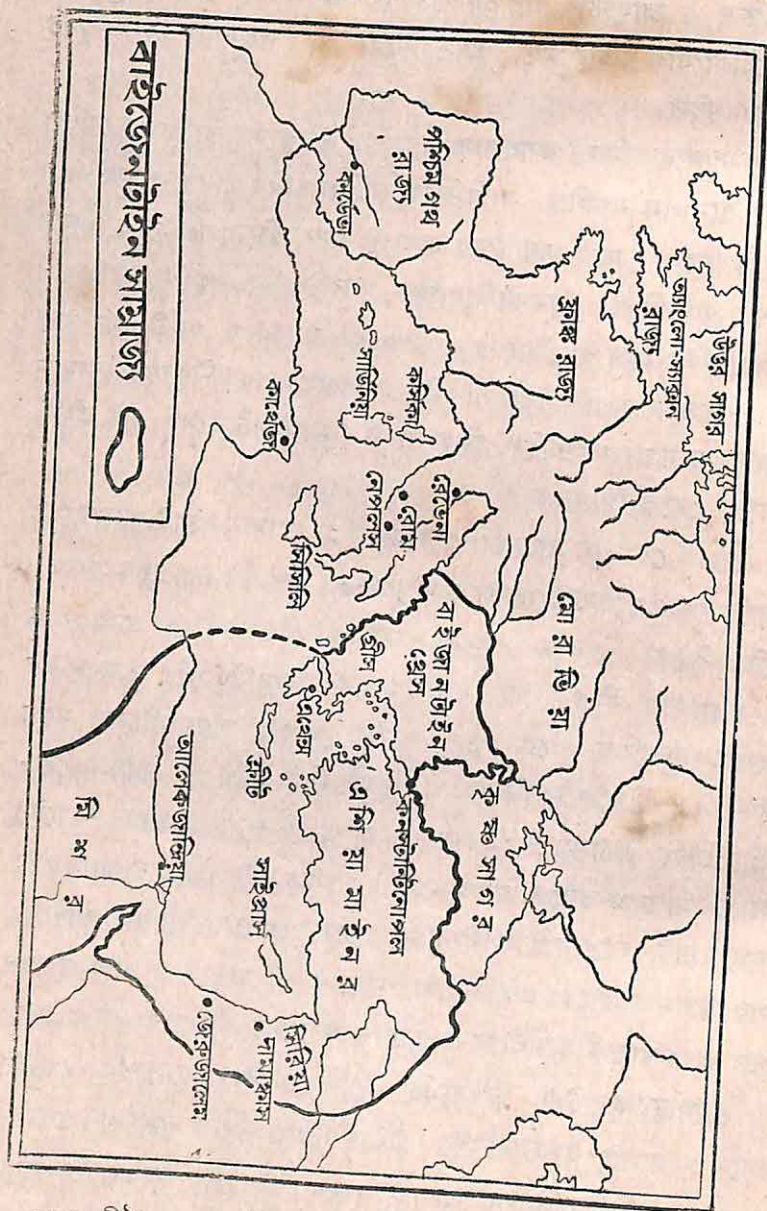
৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট কনস্টানটাইন এক ঘোষণাপত্রে খ্রীষ্টধর্মকে রাজধর্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি সম্রাটের এই

সহিষ্ণু মনোভাব খ্রীষ্টধর্মের স্থায়িত্ব ও প্রসারের পথ প্রশস্ত করেছিল। এর ফলে কনস্টানটাইন যেমন জনসাধারণের বিপুল অংশের সহানুভূতি লাভ করলেন, তেমনি খ্রীষ্টান ধর্মের ব্যাপক প্রসারও ঘটতে লাগল। এরপর থেকে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঐ ধর্মমত গ্রহণ করতে লাগল। সম্রাটের এই সহনশীল মনোভাবের জন্য চার্চগুলিও রোমান সম্রাটদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং রোমান সাম্রাজ্যের কল্যাণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তারাও তাদের শক্তি নিয়োগ করতে থাকে। বাইজানটাইন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান চার্চগুলির তথা খ্রীষ্টধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

খ্রীষ্টধর্ম ও কনস্টানটাইন : সম্রাট কনস্টানটাইন ঠিক কোন সময়ে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায় না। তিনি খ্রীষ্টান প্রজা ও খ্রীষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানের হৃত বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সব প্রজাকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সম্রাটের এই উদার মনোভাবে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারিত হল। এই ধর্মের সাম্য, দয়া ও উদারতার আদর্শ অন্যান্য পৌত্তলিক ধর্মের আবেদনকে বহুলাংশে ম্লান করে দিল। ফলতঃ সেগুলি অর্থহীন ধর্মে পরিণত হল। সম্রাট কনস্টানটাইনের অপর উল্লেখযোগ্য কাজ হল ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানের যাজকদের করপ্রদান হতে মুক্তিদান। জানা যায়, ক্যাথলিক যাজকদের এই সুবিধা তিনি দান করেন তাঁর সিংহাসন আরোহণের পরের বছর (৩২১ খ্রীঃ)। তাঁর ঐকান্তিক উদ্যোগে কনস্টান্টিনোপল একটি খ্রীষ্টান শহরে পরিণত হল।

এইভাবে চার্চ ও সম্রাট পরস্পর ঘনিষ্ঠ মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হলেন, খ্রীষ্টান চার্চও পরিণত হল বিরাট প্রভাবশালী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে।

রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান : ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে চল্লিশ বছর বয়সে জাস্টিনিয়ান বাইজানটাইন বা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্কুপির নিকট কোন এক শহরে বর্বর কৃষক পরিবারে জাস্টিনিয়ানের জন্ম হয়। তাঁর যেমন ছিল বুদ্ধি, তেমনি ছিল

সাহস। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যে এবং রাজনীতিতে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁর সময় থেকেই বাইজানটিয়ানের ইতিহাসে সুবর্ণ যুগ দেখা দেয়।

জাস্টিনিয়ান ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, সুদক্ষ শাসক, নিরলস কর্মী ও ধর্মতত্ত্ববিদ্। তাঁর রাজত্বকালে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, আইনবিদ ও স্থপতির আবির্ভাব ঘটে। তিনি রোমান সাম্রাজ্যের গৌরব, মহত্ত্ব ও আদর্শ সম্বন্ধে মহৎ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি যেমন ছিলেন স্বেচ্ছাচারী শাসক, তেমনি ছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের প্রকৃত পথপ্রদর্শক। জাস্টিনিয়ান কঠোর হাতে শাসন পরিচালনা করে বর্বর জাতির আক্রমণ থেকে রোমান সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন।

সম্রাট জাস্টিনিয়ান ও তাঁর সভাসদগণ

ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনে জাস্টিনিয়ানের কৃতিত্ব : ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, সাহসিকতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা ক্রমাগত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন জাস্টিনিয়ান এক ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠনের কাজে। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি এই কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। প্রথমেই তিনি স্বীয় বাহুবলে বর্বর জাতিদের কাছ থেকে দক্ষিণ স্পেন পুনরুদ্ধার করেন এবং ভ্যাণ্ডালরাজ্য ধ্বংস করে উত্তর আফ্রিকা পুনরধিকার করলেন। তিনি বর্বর গথ-অধিকৃত

ইতালি আক্রমণ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নেপল্‌স, রোম এবং রাভেনা জয় করেছিলেন। রাভেনা বিজয়ের মধ্য দিয়ে সমগ্র ইতালির উপর বাইজানটাইন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় (৫৫২ খ্রীষ্টাব্দ)। রাজনৈতিক ও বাণিজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাস্টিনিয়ান পারস্য দেশের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর পারস্য-রাজ জাস্টিনিয়ানের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। পারস্য যুদ্ধে জাস্টিনিয়ান অসাধারণ শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেন।

রোমান আইন-বিধির সংকলন ঃ কেবলমাত্র যোদ্ধা বা বিজয়ী বীর হিসেবেই নয়, জাস্টিনিয়ান স্মরণীয় হয়ে আছেন রোমান আইন-বিধির সংকলক হিসেবে। জাস্টিনিয়ানের পূর্বে দ্বিতীয় থেডোসিয়াস বিধিবদ্ধ আইনগুলিকে একটি সুশৃঙ্খল রূপ দেবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সম্রাট হিসেবে জাস্টিনিয়ানের সর্বপ্রথম কাজ হল বিক্ষিপ্ত আইনগুলিকে সুশৃঙ্খল রূপে বিধিবদ্ধ করা। এই দুরূহ কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যে-সব আইন বিশারদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মন্ত্রী ট্রিবোনিয়ান। জাস্টিনিয়ানের আদেশে এবং ট্রিবোনিয়ানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি পূর্ব সংকলনের অনুকরণে হ্যাড়িয়াস থেকে শুরু করে জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকাল পর্যন্ত সমস্ত বিধিবদ্ধ আইনগুলিকে সুবিন্যস্ত করে একটি-মাত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। এটিই ছিল জাস্টিনিয়ানের বিখ্যাত আইনবিধি বা জাস্টিনিয়ান কোড। আদালত ও আইন বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ নির্ধারিত বিধিরূপে গৃহীত হয়। এই প্রামাণ্য-গ্রন্থে আইনের মৌল বিধিগুলির বিভিন্ন ধারা সংযোজিত হওয়ায় রোমান আইন সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয়। এই আইন-গ্রন্থ রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রীক ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছিল।

জাস্টিনিয়ান

দেশের আইনবিধিকে এইভাবে সঠিক ও যথাযথ রূপ দেওয়ায় দেশের সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের

সর্বত্র যাতে একই আইন চালু থাকে এবং জনগণ যাতে আইনের ন্যায়-বিচার পেতে পারে সে বিষয়ে বহুদর্শী ও বিচক্ষণ সম্রাট জাস্টিনিয়ান খুবই সচেতন ছিলেন। সুশৃঙ্খল আইন-ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রত্যেক দেশের সভ্য সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাস্টিনিয়ান সেই ব্যবস্থা প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎরূপে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকরূপে জাস্টিনিয়ানঃ সম্রাট জাস্টিনিয়ানের শাসনকাল বাইজানটিয়ামের শিল্পকলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। বিখ্যাত সমরনায়ক, বিশিষ্ট আইন-সংকলক সম্রাট জাস্টিনিয়ান ছিলেন শিল্প ও স্থাপত্যের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। জাস্টিনিয়ানের সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পের প্রতি অনুরাগ ছিল অতুলনীয়। তিনি নিজের রাজধানীতে সুন্দর ও মনোরম অট্টালিকা নির্মাণ করে ক্ষান্ত হন নি, সমস্ত সাম্রাজ্য জুড়ে গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য দুর্গ, মঠ, গীর্জা ও হাসপাতাল। তিনি বলকান উপদ্বীপে তিনশ'র বেশী দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। কনস্টান্টি-নোপলের সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা নির্মাণ করতে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। এর বিশালতায় জনগণ অভিভূত হয়ে পড়ত। তাঁর সময় নির্মিত সৌধ ও অট্টালিকার স্থাপত্যশৈলী সকলকে মুগ্ধ করত। জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকালে চিত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। সৌধসমূহের দেওয়াল-গাত্রে মনোরম চিত্র আঁকা হত। এই অঙ্কন-কার্যে সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অপরিসীম। সে যুগের বহু বিশিষ্ট শিল্পী তাই জমায়েত হয়েছিলেন কনস্টান্টিনোপল শহরে সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের আশায়। এলগ্রেকো ছিলেন বাইজানটিয়ামের প্রখ্যাত শিল্পী। এছাড়াও বাইজানটিয়ামের স্বর্ণশিল্পীরা ছিলেন খুবই উল্লেখযোগ্য। রাভেনা শহরের যাদুঘরে রক্ষিত আছে হাতির দাঁতের কারুকার্য শোভিত নানা শিল্প নিদর্শন।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে বাইজানটাইনের গুরুত্ব ঃ সম্রাট কনস্টানটাইন রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম থেকে বাইজানটিয়ামে সরিয়ে আনায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে বাইজানটিয়ামের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বেড়ে যায়।

বাণিজ্যিক কেন্দ্র ঃ বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের প্রথম যুগে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করায় রাজধানী বাইজানটাইন ক্রমান্বয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেই সময় পূর্ব দিকই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান ঘাঁটি। এই বাণিজ্য অবশ্য সীমাবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র বিলাসদ্রব্যসমূহের ব্যবসায়ে। লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। চীনের রেশম, ভারতের নানারকমের বিলাসদ্রব্য এবং সিংহলের মুক্তা —এসব ছিল প্রধান প্রধান বাণিজ্য পণ্য। সিরিয়াতে উৎপন্ন হত উৎকৃষ্ট রঙীন কাপড়। এশিয়া মাইনর ও ইতালিতে তৈরি হত মাদক দ্রব্য। জীবনধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবসার বিশেষ প্রচলন ছিল না। জলপাই উৎপাদক অঞ্চল হতে ভোজ্য তেল আমদানী করা হত। মিশর থেকে কনস্টান্টিনোপলে এবং আফ্রিকা থেকে রোমে খাদ্যদ্রব্য আনা হত। লোহা, নানা প্রকার ধাতু ও মাটির পাত্র পশ্চিমদিকে চালান দেওয়া হত। ধাতুনির্মিত অস্ত্র বাইজানটিয়ামে ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হত। বাইজানটিয়ামের অভিজাত শ্রেণী ও নাগরিকরা ধাতুনির্মিত বাসন ও মাটির তৈজসপত্র ব্যবহার করত। ব্যবসা সংস্থাসমূহের সদস্যপদ সম্রাটগণ আবশ্যিক ও উত্তরাধিকারসূত্রে করে গিয়েছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দেবার জন্য।

বাইজানটাইনের সংস্কৃতি ঃ বাইজানটিয়াম শহরের তিনদিকে ছিল সমুদ্র আর উত্তর-পশ্চিম দিকটা ছিল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এর ফলে বৈদেশিক আক্রমণের বিশেষ কোন সম্ভাবনা না থাকায় বাইজানটিয়ামে সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব হয়। কলা, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, আইন-রীতিনীতি ও চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছিল।

স্থাপত্য শিল্পে বাইজানটিয়ামের অবদান ছিল যথেষ্ট। বহু নতুন মঠ ও গীর্জা নির্মাণ করা হয়েছিল। এগুলির নির্মাণকৌশল আজও দর্শককে মুগ্ধ করে। এছাড়া প্রাচীন গ্রীক শিল্প ও ভাস্কর্যের সংস্কার করা হয়। অ খ্রীষ্টান প্রাচীন ঋষি ও কবিদের রচিত সাহিত্য ও দর্শনের পাণ্ডুলিপিগুলি রক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়।

সে যুগে বাইজানটিয়ামের শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত রোমান নাগরিকরা আইন পাঠে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। আইন পঠন-পাঠনের জন্য গড়ে উঠেছিল বহু আইন বিদ্যালয়। আইনজ্ঞ হতে পারলে যে-কোন লোক রাষ্ট্র ও সমাজে খুবই গণ্যমান্য হতেন। একজন যোগ্য আইনজ্ঞ প্রাদেশিক শাসনকর্তা অথবা মন্ত্রীর পদও অলংকৃত করতে পারতেন।

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পৌত্তলিক। ইন্দ্রজাল ও অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে তারা বিশ্বাসী ছিল। সাম্রাজ্যের অধিকাংশ জনগণই গ্রীক বা ল্যাটিন ভাষা জানত না। রাইন নদীর পশ্চিমে এক ব্যাপক অঞ্চলে জুড়ে জার্মান ভাষার প্রচলন ছিল। আফ্রিকার মূরগণ কথা বলত তাদের আঞ্চলিক ভাষায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাধারাও পরিবর্তন হয়। উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিরা ব্যাপকভাবে গ্রীক-সাহিত্য অধ্যয়ন করতেন। পাণ্ডুলিপির নকল ও সংরক্ষণ করা ছাড়াও বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পণ্ডিতগণ বিশ্বকোষ ও অভিধান রচনা করতেন। এই সময় ইতিহাস-চর্চাও বেশ গুরুত্ব পেয়েছিল। এই যুগের অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইউসেরিয়াস অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ইতিহাস রচনা করেছিলেন। অবশ্য তা' ছিল সংকলিত উপাদানসমূহ থেকে রচিত ধর্মীয় ইতিহাস। দর্শন চর্চাতেও বাইজানটিয়ামের মানুষের বিপুল আগ্রহ ছিল। এই সময়ের খ্যাতিমান দার্শনিক ছিলেন প্লাটিনাস।

নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ছিল বাইটানটিয়ামের অধিবাসীদের চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও পুরুষেরা নারী ও শিশুদের রক্ষা করত।

বাইজানটিয়াম সুরক্ষিত নগরী হলেও এই নগরী পূর্ব ও পশ্চিম জগতের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল্যায়ন করতে শেখে। ধর্ম ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে তারা উচ্চ ধারণার অধিকারী হয়। এক কথায় বলতে গেলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে বাইজানটাইন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সারা ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল।

॥ অনুশীলনী ॥

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। বাইজানটিয়ানের কনস্টান্টিনোপল নাম হল কেন? এটি কোন সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল?
২। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি সম্রাট কনস্টানটাইন কেন উদার মনোভাব প্রদর্শন করলেন?
৩। খ্রীষ্টধর্ম কখন রাজধর্মে পরিণত হয় এবং এর ফলাফল কি হয়েছিল?
৪। 'জাস্টিনিয়ান কোড' বলতে কি বোঝ?
৫। জাস্টিনিয়ান কিভাবে শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন?
৬। সেন্ট সোফিয়া গীর্জা কে কোথায় নির্মাণ করেছিলেন?
৭। বাইজানটাইনের সংস্কৃতি-বিকাশে ভৌগোলিক অবদান কি ছিল?
৮। বাইজানটাইনের আইনবিদ্‌দের মর্যাদা কেমন ছিল?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। সম্রাট কনস্টানটাইন রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় এবং কেন স্থানান্তরিত করেছিলেন?
২। সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীষ্টধর্মকে কিভাবে এবং কোন উদ্দেশ্যে রাজধর্মে পরিণত করেন?
৩। সম্রাট জাস্টিনিয়ান ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা করেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৪। জাস্টিনিয়ান রোমান-আইন সংস্কার ও বিধিবদ্ধ করবার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?
৮। স্থাপত্য ও শিল্পকলার উন্নতির জন্য জাস্টিনিয়ান কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?
৬। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে বাইজানটিয়ানের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৭। ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বাইজানটিয়ানের অবদানের কথা সংক্ষেপে লেখ।

সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ

(ক) ট্রিবোনিয়ান, (খ) জাস্টিনিয়ান কোড, (গ) এলগ্রেকো।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

পাশের বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও ঃ—

(ক) — নাম অনুসারে বাইজানটিয়ানের নাম হয় কনস্টান্টিনোপল।

[কনস্টানটিয়ান / জাস্টিনিয়ান]

(খ) — এর রাজত্বকালে যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

[সম্রাট টাইবেরিয়ান / সম্রাট অগস্টাস]

(গ) — খ্রীষ্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধর্মে পরিণত করেন।

[কনস্টানটাইন / ডায়োক্লেটিয়ান]

(ঘ) বাইজানটাইনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন —।

[ইউসেরিয়াস / প্লাটিনাস]

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

১। কনস্টান্টিনোপলের বর্তমান নাম কি ?

২। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য কোথায় ছিল ?

৩। খ্রীষ্টধর্ম কে প্রচার করেন ? তাঁহার জন্মস্থান কোথায় ? কি ভাবে তাঁহার মৃত্যু হয় ?

৪। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের জন্মস্থান কোথায় ? কোন সময়কে বাইজানটিয়ামের সুবর্ণ যুগ বলা হয় ?

৫। বাইজানটাইন সভ্যতার যুগে নিম্নলিখিত খ্রীষ্টাব্দগুলির গুরুত্ব বল ঃ ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ ; ৩১৩ খ্রীষ্টাদে ; ৫৫২ খ্রীষ্টাব্দ।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

নিচের প্রশ্নগুলির মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

(ক) কনস্টান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

(খ) খ্রীষ্টধর্মকে রাজধর্মরূপে কে স্বীকৃতি দেন ?

(গ) জাষ্টিনিয়ান কত খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন ?

(ঘ) সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা কে নির্মাণ করেন ?

(ঙ) রোমান আইন কার নির্দেশে বিধিবদ্ধ হয় ?

(চ) বাইজানটিয়ামের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের নাম কি ?

ইসলাম সভ্যতা ও তার প্রসার

আরবদেশ ও জনগণ ঃ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবিশাল আরব উপদ্বীপ ছিল আরবদের বাসভূমি। আরব মরুভূমির দেশ, কৃষিকার্যের আদৌ উপযোগী নহে। আরবদেশের অভ্যন্তর ভাগ পর্বত দ্বারা বিভক্ত। সমুদ্রতীরের অংশ কৃষিকাজের উপযোগী। লোকসংখ্যাও বেশী। অবশিষ্ট অংশ বালুকাময় বিস্তীর্ণ মরুভূমি। ফলে সভ্য জগতের সঙ্গে ইহা প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন ছিল। ইয়েমেন, হেজ্জাজ, হদ্রমৎ প্রভৃতি স্থান ছিল জনবহুল এবং আরবের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ লোহিত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। মরুভূমির আশে পাশে ছোট ছোট মরূদ্যান আছে। আরবদেশের সীমা প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন ও আসিরিয়া সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। প্রাচীনকালে এখানে নানা যাযাবর উপজাতীয় লোক বাস করত। আরবের জনগণ বলতে এই যাযাবর মানুষদেরই বুঝায়। এরা 'বেদুইন' নামে পরিচিতি। আরবী ভাষায় বেদুইন শব্দের অর্থ স্তেপভুমির বাসিন্দা। এই বেদুইনদের মধ্যে অধিকাংশই বাস করত আরবদেশের মধ্য অঞ্চলের স্তেপভূমিতে। এদের প্রধান বৃত্তি ছিল পশুপালন। এরা এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করত না। আশ্রয়ের সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াত। এদের বলা হত যাযাবর।

আরবের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের মরুদ্যানে কিছুসংখ্যক মানুষ স্থায়ীভাবে বাস করত। এরা কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ. করত। খেজুরগাছের ছায়ায় কিংবা কোন ফলের বাগানের ধারে এরা তাদের বাসস্থান তৈরি করত।

আরবের অধিবাসীরা প্রধানত দু'টি শাখায় বিভক্ত ছিল। এদের একটি বেদুইন নামে পরিচিত—অন্যরা 'শেখ'। এরা চাষ করত এবং

ঘর বেঁধে বাস করত। উঠের পিঠে পণ্য বোঝাই করে তারা দেশ-বিদেশে বাণিজ্য ধনী হয়ে উঠেছিল। এদের প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর, দুধ ও পশুর মাংস। উঠ ছিল তাদের প্রধান বাহন ও অবলম্বন। বেদুইনরা ছিল যাযাবর প্রকৃতির। এরা পশুপালন করত এবং লুঠতরাজ, যুদ্ধবিগ্রহ করায় এরা ছিল সিদ্ধহস্ত।

আরবদের সমাজ-জীবন: সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে আরবের সমাজ বলতে বোঝাত উপজাতি সমাজ। উপজাতিদের মধ্যে যাদের বিরাট পশুচারণ ক্ষেত্র ও বিপুলসংখ্যক পশুর পাল থাকত তারা অভিজাত বলে গণ্য হতো। এই অভিজাতদের মধ্য থেকেই নেতা ঠিক করা হতো। এই নেতারাই হতেন সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সাধারণ বেদুইনদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। একমাত্র বেঁচে থাকবার জন্যই তাদের কঠোর শ্রম করতে হতো। অভিজাত শ্রেণীর মানুষগুলি নিজেদের স্বার্থে গরীব বেদুইনদের নানাভাবে নিপীড়ন করত। ফলে উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ শুরু হত।

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আরবের ধনী ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দুর্ধর্ষ যাযাবর বেদুইনদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলি আক্রমণ করতে প্ররোচিত করে। যাযাবর উপজাতিরাও প্রতিবেশী রাজ্যের সমৃদ্ধি ও সম্পদের লোভে নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ঠিক এই সময়েই আরবদেশে হজরত মহম্মদের আবির্ভাব ঘটে।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে আরবের লোকেরা নানা দেবতার পূজো করত। তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। দেবতার মধ্যে আল্লাহ্ ছিলেন প্রধান বা ঈশ্বর। নরবলি দিয়ে দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার বিধানও তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তারা অশরীরী আত্মা বা 'জিন'-এ বিশ্বাস করত। গাছ, পাথর বা অন্য কিছুকে অবলম্বন করে জিন বাস করত বলে তাদের বিশ্বাস ছিল। তারা মনে করত তাদের জীবনের সবকিছু ভালোমন্দ, উত্থান-পতন সবই নির্ভর করত জিনের ইচ্ছার উপর। সেজন্য তারা নানারকম উপহার দিয়ে জিনকে সন্তুষ্ট রাখার

চেষ্টা করত। মক্কায় কা'বা নামে মন্দির ছিল। এখানে একটি কাল পাথর আছে। শোনা যায়, মানুষ জন্মাবার বহু আগে থেকেই এই পাথরখানা মাটিতে পড়ে আছে। বর্তমানে কা'বা মন্দিরে কোন দেবদেবীর মূর্তি না থাকলেও এই পাথরখানা লক্ষ লক্ষ মানুষের পূজো পেয়ে আসছে। আরব সমাজের এরূপ কুসংস্কারের দিনে হজরত মহম্মদ এক নতুন ধর্ম প্রচার করে যাযাবর উপজাতিদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং তাদের মধ্যে গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেন।

হজরত মহম্মদ ঃ ৫৭০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময় মক্কা শহরের সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। তার আসল নাম ছিল আবুর করিজম। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লা এবং মাতার নাম আমিনা বিবি। শৈশবেই পিতামাতাকে হারিয়ে মহম্মদ প্রথমে পিতামহ এবং পরে এক পিতৃব্যের কাছে সস্নেহে পালিত হন। বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। উট ও ভেড়া চরিয়ে দিন যাপন করতেন। শিক্ষিত না হলেও মহম্মদের বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ, স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মন ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলো এবং তিনি ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কে অনেক তথ্য আহরণ করেছিলেন। মহম্মদ পঁচিশ বছর বয়সে খাদিজা নামে এক ধনী মহিলাকে বিবাহ করেন।

ধর্মপ্রচারকরূপে হজরত মহম্মদ ঃ আরব সমাজের পৌত্তলিকতা ও অনাচারে মহম্মদ দিন দিন ব্যথিত হতে থাকেন। আরব সমাজকে সংস্কারমুক্ত করতে তিনি বদ্ধপরিকর হলেন। মক্কার সন্নিকটে এক পাহাড়ের গুহায় বসে মহম্মদ গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। অবশেষে তিনি সত্যের আলো দেখতে পেলেন। ইশ্বরের জ্ঞানবাক্য তাঁর কাছে প্রকাশিত হল। মহম্মদ এক দৈববাণী শুনতে পেলেন— 'ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তাঁকে আল্লাহ্ বলা হয়। মহম্মদ আল্লাহ্-এর রসুল অর্থাৎ পয়গম্বর বা দূত।' মহম্মদকে আল্লাহ্-এর বাণী প্রচার করতে হবে। মহম্মদের বয়স যখন ৪০ বছর তখন তিনি মক্কা শহরে একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে পরিচিত হলেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম

প্রথমে গ্রহণ করেন তাঁর স্ত্রী খাদিজা ও পরিবারের কয়েকজন লোক। মহম্মদ যে ধর্ম প্রবর্তিত করেছিলেন তার নাম 'ইসলাম' ধর্ম। ইসলাম কথাটির অর্থ হলো ভগবান অর্থাৎ আল্লাহ্-র নিকট সমর্পিত-প্রাণ। অল্পকালের মধ্যেই বেশ কিছুসংখ্যক লোক তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করলে তিনি মক্কায় পৌত্তলিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। ফলে মক্কা শহরের বহুলোক তাঁর শত্রু হয়ে উঠল এবং তিনি বাধ্য হয়ে তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে মক্কা পরিত্যাগ করে মদিনায় চলে গেলেন। মহম্মদের অনুচরদের মধ্যে ছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য আবুবকর। মহম্মদের মৃত্যুর পর ইনিই প্রধান নেতা বা খলিফা হন।

হিজরী সন ঃ মহম্মদের মদিনা আগমনের বছর থেকেই মহম্মদের অনুগামীরা একটি বছর গণনা শুরু করেন। এর নাম হিজরী (৬২২ খ্রীঃ)। মদিনার অধিবাসীরা মহম্মদকে সাদরে গ্রহণ করল। তারা দলে দলে তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করতে থাকল। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই হজরত মহম্মদ এক বিশাল অনুগামী-গোষ্ঠীর নেতারূপে আবির্ভূত হলেন। মদিনার অধিবাসীরা এই ধর্ম প্রচারের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হল না।

হজরত মহম্মদের মক্কা অভিযান ঃ হজরত মহম্মদ তাঁর ধর্মমত প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় দশ হাজার অনুগামী সৈন্যদল নিয়ে মক্কা আক্রমণ করতে অগ্রসর হলেন। মক্কাবাসীরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পরাজয় স্বীকার করল। ৬৩০ খ্রীস্টাব্দে বিজয়ী মহম্মদ মক্কা প্রবেশ করলেন। মহম্মদ মক্কাবাসীদের অপরাধ ক্ষমা করলেন। মহম্মদের এরূপ সদয় ব্যবহারে মক্কাবাসীরা দলে দলে মহম্মদের ধর্মমত গ্রহণ করল।

ইসলামের ধর্মমত ঃ মহম্মদের প্রচারিত ধর্মের নাম 'ইসলাম'। ইসলাম শব্দের অর্থ হল 'ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন'। যাঁরা এই ধর্ম গ্রহণ করেন তারা ঈশ্বরের কাছে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করেছেন এটাই মনে করা হয়। ইসলাম একেশ্বরবাদী। ইসলামের মত মহম্মদ হলেন ঈশ্বর বা আল্লাহ্-র শেষ প্রেরিত পুরুষ—পয়গম্বর। আল্লাহ্-র নিকট হতে মহম্মদ যে-সকল বাণী ও উপদেশ পেয়েছিলেন তাদের

একত্র করে 'কোরান' নামে গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে কোরান অতি পবিত্র গ্রন্থ।

ইসলাম ধর্মে কোন জাতিভেদ নেই। পৃথিবীর মুসলমানগণ তাদের ভাই মনে করেন, সাম্যের বন্ধনে আবদ্ধ মনে করেন। মহম্মদের পরে আরও অনেক উপদেশ ও আচরণবিধি-সংক্রান্ত নির্দেশ একত্র করে 'হাদিশ' নামে আরও একটি গ্রন্থ রচিত হয়।

ইসলামের অগ্রগতি : হজরত মহম্মদ মুসলমানদের মধ্যে যে উদ্দীপনা, শক্তি ও ঐক্যের সঞ্চার করেছিলেন তা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং অচিরকাল মধ্যে ইসলাম মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হল। ইসলাম ধর্মের প্রসারের অনেকগুলি কারণ বিদ্যমান ছিল যেমন—(১) ইসলামের একেশ্বরবাদ, সহজ-সরল আচরণ ও অনুষ্ঠানবিধি সাধারণ লোকের মধ্যে পালন করা খুবই সহজ ছিল। (২) তৎকালীন অন্যান্য ধর্মের মধ্যে নানা জটিল পূজাবিধি ও বলিপ্রথা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। ইসলামধর্ম এসব থেকে মুক্ত থাকায় সাধারণ মানুষের কাছে এর আবেদন খুবই আকর্ষণীয় হয়। (৩) ইসলাম সকল মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ ও ঐক্যবোধ জাগাবার জন্য সাম্যের উপর গুরুত্ব দান করে। সেকালের মানুষের মধ্যে এটা ছিল খুবই অভাবনীয়। এই-সব অনুকূল কারণের জন্য ইসলামের সাম্যচিন্তা সেকালের মানুষের মনে গভীর সাড়া জাগায়। তৎকালীন আরবদের মানসিক অবস্থাও ইসলামধর্ম বিস্তারের পক্ষে এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন উপজাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত যাযাবর বেদুইনরা ইসলামের ঐক্য ও সাম্যচিন্তার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব বিকাশের পথ খুঁজে পায়। তারা বুঝতে পারে—তাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন স্থাপিত হলে তাদের শক্তি হবে অপ্রতিহত। তাছাড়া ইসলাম-বিরোধী বিধর্মীদের বিরুদ্ধে কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী জেহাদ ঘোষণার প্রবল উন্মাদনাও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে ও অধিকার সম্প্রসারণ করতে প্রয়াসী করে তোলে। এই সব অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগে মহম্মদের মক্কাজয়ের পর আরবের অন্যান্য অঞ্চলে ইসলামধর্মের প্রতিষ্ঠা ও দ্রুত প্রসার

হতে থাকে। ফলে মহম্মদ অচিরকাল মধ্যে মুসলমান সমাজে ধর্মীয় নেতা থেকে এক অবিরোধী সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতায় রূপান্তরিত হন। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই জুন প্রার্থনারত অবস্থায় মহম্মদ পরলোক গমন করেন। তার মৃত্যুর পূর্বেই আরব দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল।

আবুবকর : অপুত্রক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান শিষ্যরা মিলিত হয়ে আবুবকরকে মহম্মদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। মহম্মদের প্রতিনিধি 'খলিফা' অ্যাখ্যা লাভ করলেন। খলিফা ছিলেন মুসলমানদের শাসনকর্তা ও ধর্মগুরু। আবুবকর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আর একজন শিষ্য ওমর-কে পরবর্তী খলিফারূপ নির্বাচিত করে যান।

আরব অভিষান : খলিফা নির্বাচিত হয়েই আবুবকর কয়েক হাজার বিশ্বস্ত ধর্মযোদ্ধা নিয়ে বিশ্ববিজয়ে যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আরব যোদ্ধারা প্রথমেই বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ারমুকের যুদ্ধে বাইজানটানীয় বাহিনী আরব যোদ্ধাদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আরবরা অচিরকাল মধ্যেই একে একে সিরিয়া, দামাস্কাস, পামিরা, আন্টিয়োক, জেরুজালেম ও অন্যান্য অঞ্চল অধিকার করে। এরপর আরব-বাহিনী পারস্য আক্রমণ করে। ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে কাদেশিয়ার যুদ্ধে পারসিকগণ তুমুল যুদ্ধ করেও শোচনীয় পরাজয় বরণ করল। পরাজিত পারসিকরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হল।

পারস্য বিজয়ের পর আরববাহিনী পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। কিছুকালের মধ্যে সমগ্র তুর্কীস্থান তাদের অধিকারে আসে। ফলে আরব সাম্রাজ্য পূর্বদিকে চীন সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর পর আবরবাহিনী পশ্চিম দিকে অভিযান করে।

এই অভিযানের ফলে মিশর আরবদের অধিকারভুক্ত। মিশর জয়ের পর আরব অভিযান আফ্রিকার উত্তর উপকুল বরাবর পশ্চিম মুখে জিব্রাল্টার প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ৭২০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের মধ্যে আরব অধিকার উত্তরে পীরেনীজ পর্বতমালার সন্নিহিত

অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে মধ্য ফ্রান্স আরব আক্রমণে বিব্রত হয়ে পড়ে। অতঃপর পশ্চিম ইউরোপের রাজন্যবর্গ আরব

উত্তর আফ্রিকা, স্পেন প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামের প্রসার
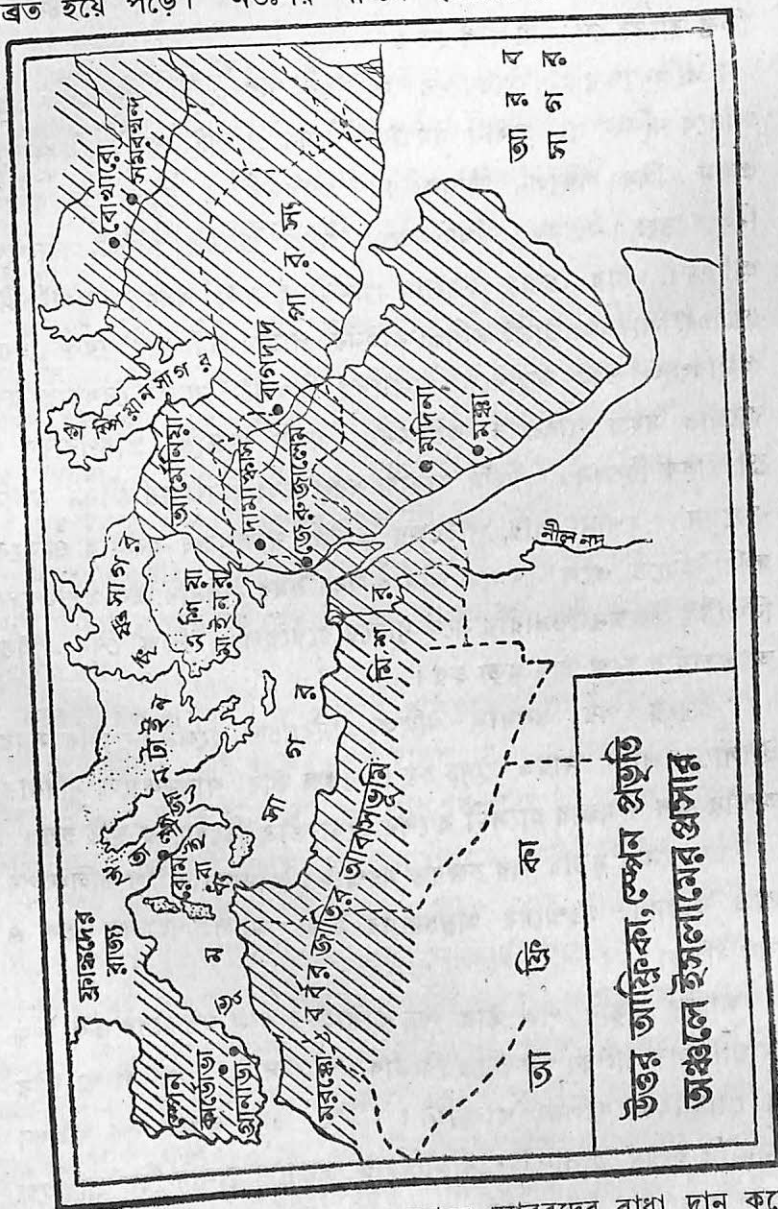
আক্রমণে শঙ্কিত হয়ে সমবেতভাবে আরবদের বাধা দান করে। পোয়েতিয়ার্সের যুদ্ধে আরববাহিনী পরাজিত হয়।

ঈজিপ্ট অভিযানের সময় আরবগণ নৌ-শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠে। তারপর কয়েকবার কনস্টান্টিনোপল অধিকার করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

খলিফাতন্ত্র ঃ আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবে খলিফা বা প্রধান ধর্মগুরুর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের প্রথম খলিফা ছিলেন আবুবকর। আবুবকরের মৃত্যুর পর খলিফা নিযুক্ত হলেন ওমর। খলিফাদের মধ্যে ওমরই ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাঁর চেষ্টায় ইসলাম পৃথিবীতে একটি ধর্মরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং আরব সাম্রাজ্য এশিয়া মাইনর, পারস্য ও মিশরে বিস্তৃত হয়। প্রজাবৎসল ওমর ছদ্মবেশে প্রজাদের দুঃখকষ্ট স্বচক্ষে দেখবার জন্য রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করতেন। ওমর অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। শোনা যায়, পারস্যের একজন রাজপুরুষ একবার ওমরকে দর্শন করতে এলে দেখতে পান খলিফা ওমর মদিনার এক মসজিদের নিকটেই একজন ভিখারীর সঙ্গে ঘুমিয়ে রয়েছেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আততায়ীর হস্তে তাঁর মৃত্যু হয়।

ওমরের পর ওসমান খলিফা নির্বাচিত হলেন। তাঁর সময় ইসলামের শক্তি আরও সুদৃঢ় হয়। কিন্তু তাঁর শাসনকালে মদিনার অম্মীয় বংশ ও মক্কার হাসেমী বংশের মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়।

ওসমানের মৃত্যুর পর হজরত মহম্মদের জামাতা আলি খলিফাপদ লাভ করেন। মহম্মদের অনুচরদের মধ্যে আলিই ছিলেন চতুর্থ ও শেষ খলিফা।

আলির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হাসানের সঙ্গে মহম্মদের এক শিষ্য মোয়াবিয়ার খলিফা পদ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় মোয়াবিয়া খলিফা থাকবেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর খলিফা মনোনীত হবেন হাসান। মোয়াবিয়ার চক্রান্তে হাসান বিষ প্রয়োগে নিহত হলেন। ঠিক হলো হাসানের ছোট ভাই হুসেন খলিফাপদে নির্বাচিত হবেন। মোয়াবিয়া তাঁর অবর্তমানে তাঁর পুত্র এজিদকে

খলিফা পদে মনোনীত করলেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে খলিফা নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে খলিফা মনোনীত হতে থাকে।

কারবালার কাহিনী ঃ এজিদের চক্রান্তে কারবালা প্রান্তরে হুসেন তাঁর অনুচরবর্গসহ, পরিবারের সকলে নির্মমভাবে নিহত হলেন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মুসলমানেরা 'মহরম' পালন করে থাকেন। কারবালা প্রান্তরে এই ঘটনা ঘটে ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমানেরা 'সিয়া' ও 'সুন্নী' নামে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 'সিয়া' সম্প্রদায় আলি ও তাঁর বংশধরদের খলিফা হিসাবে সমর্থন করে অন্যদিকে 'সুন্নী' সম্প্রদায়েরা মুয়াবিয়া ও তাঁর সম্প্রদায়কে সমর্থন করে। মুয়াবিয়া যে বংশের প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম উমায়া বংশ। তাদের রাজধানী ছিল দামাস্কাস।

এজিদের মৃত্যুর পর ওম্মিয়াদ বংশের পর পর বার জন খলিফা হন। অবশেষে তাঁদের পরিবর্তে প্রভাবশালী আব্বাসিদ বংশ খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হয়।

হারুণ-অল-রসিদ ঃ আব্বাসিদ খলিফাদের শাসনকালে ইরাক প্রবল হয়ে উঠে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন হারুণ-অল-রসিদ (৭৮৬ খ্রীঃ)। তাঁর রাজধানী ছিল বাগদাদ শহরে। খলিফা হারুণ-অল-রসিদের দান ও মহত্ব ছিল অসাধারণ। প্রজাদের সুখ-দুঃখের দিকে তাঁর সদা-জাগ্রত দৃষ্টি ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পে বাগদাদ সে যুগের খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। হারুণ-অল-রসিদ গল্প শুনতে ভালবাসতেন। এই সব গল্প সংগ্রহ করে রাখা হতো। পরে এই গল্প-সংগ্রহ 'আরব্য-উপন্যাস' বা 'আরব্য-রজনী' নামে সারা বিশ্বে খ্যাতিলাভ করে। শোনা যায়, ছদ্মবেশে বাগদাদ শহরের পথে গভীর রাতে একাকী তিনি প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে বের হতেন। কর্মচারীদের প্রত্যেকের কাজের জন্য নিজেই খোঁজ খরব নিতেন। তাঁর দরবারে অনেক জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ

ঘটেছিল। এই সময়ে বেলুচিস্তান, পারস্য, তুর্কীস্তান, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, সাইপ্রাস, ক্রীট, মিশর, উত্তর আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের সিন্ধু অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য। এই যুগে এই ঢেউ আফ্রিকার মধ্য দিয়ে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত প্রসারলাভ করেছিল।

আরব সাম্রাজ্যের পতন: আরব সাম্রাজ্যের মধ্যে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বৃদ্ধি, স্থানীয় শাসকদের হাতে অর্থনৈতিক ও শাসন-বিষয়ক ক্ষমতা, খলিফাদের ব্যয়ভার মিটাতে উত্তরোত্তর করবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণগুলি জনসাধারণের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে আরব সাম্রাজ্য জনসাধারণের সমর্থন-বঞ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে পতনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। নবম শতকের প্রথম দিকে মধ্য এশিয়া ও ইরান স্বাধীনতা ঘোষণা করে। নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সিরিয়া, ঈজিপ্ট এবং প্যালেস্টাইন আবরদের অধীনতা অস্বীকার করে। দশম শতকের মাঝামাঝি সময় খলিফার শাসন কেবলমাত্র রাজধানী বাগদাদ ও সন্নিহিত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে আরব সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

আরব সাম্রাজ্য ও ইসলামী সংস্কৃতি

উত্তর আফ্রিকার উপকুল অঞ্চল আরবগণ অধিকার করার পর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে তারা স্পেন দেশের অধিকাংশ অঞ্চল অধিকার করে। দেশজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরব, সিরিয়া, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা হতে দলে দলে মুসলমান স্পেনে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে। স্পেনের আরবগণ মুর নামে পরিচিত। স্পেন রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ডোবা। এই নগরের বিশ্ববিদ্যালয় জগদ্বিখ্যাত ছিল। দেশ-বিদেশের ছাত্র ও পণ্ডিতগণ বিদ্যাচর্চার জন্য এখানে মিলিত হতেন এবং এখানে ধর্ম, সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। কর্ডোবা নগরে অসংখ্য গ্রন্থাগার ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজবাড়ীর গ্রন্থাগার। আরবীয় বা অ্যারাবেস্ক নামে এক নতুন

শিল্পরীতি এখানে গড়ে উঠেছিল। মূর চিত্রকরেরা নানারকমের রেখাচিত্রের সাহায্যে এক মনোরম চারুশিল্পের সৃষ্টি করেছিলেন। কর্ডোবার ২৭টি উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে ইহুদী পণ্ডিতেরাই ছিলেন সবচেয়ে অগ্রণী।

অল্পকালের মধ্যেই কর্ডোবা ব্যতীত স্পেনের শেভিল, টোলেডো ও গ্রাণাডা প্রভৃতি প্রদেশে ইসলামধর্ম, আরবী ভাষা ও রীতি-নীতি প্রচলিত হল। কর্ডোবা নগরে তিন হাজার আট শত মসজিদ, আশি হাজার দোকান, আট হাজার অট্টালিকা, এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য স্নানাগার ছিল। কর্ডোবার মসজিদে গাছের পাতার কারুকার্য বিশিষ্ট নকশা আছে। গ্রাণাডার 'আলহামরা' প্রাসাদটির শিল্পকৌশল অসাধারণ। নানারূপ লতাপাতা ও আরবী অক্ষরের কারুকার্যে এই প্রাসাদের স্তম্ভ ও ফটকগুলি শোভিত।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের অবদানঃ আবরগণ যে কেবল বিশাল সাম্রাজ্যই প্রতিষ্ঠা করেছিল তা নয়, তারা দেশ-বিদেশ থেকে নানাবিধ জ্ঞান আহরণ করে নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল। আরবীয়রা মধ্যপ্রাচ্যের লোক ; তাদের সাম্রাজ্যের পূর্ব-দিকে পারসিক, ভারতীয় ও চীন সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বহু উপাদান আরবগণ এই সকল দেশ থেকে গ্রহণ করেছিল। আরিস্টটলের চিন্তাধারা এই যুগে আবার নতুন ভাবে প্রসারিত হতে থাকে। আরবীয় পণ্ডিতগণ ভারতের কাছে থেকে প্রথম 'শূন্য' সংখ্যার ব্যবহার শিখে নেন। জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ভারতের অবদানের কথা প্রধানতঃ আরবদের মাধ্যমে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। বীজগণিত বা অ্যালজেব্রা আরবদের আবিষ্কার।

কাব্য-সাহিত্য, শিল্পকলা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, আকাশতত্ত্ব ও রসায়ন-শাস্ত্রে আরবদের অতুলনীয় অবদান রয়েছে। ইসলামী আরবেরা ফলিত রসায়নের চর্চা করতেন। তাঁদের এই বিদ্যার নাম ছিল আলকেমি। এই বিদ্যার সাহায্যে তাঁরা নানা ধরনের ধাতু-নিষ্কাশন প্রণালী আবিষ্কার করেন।

চৈনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আরবেরা কাগজ ও বারুদ তৈরী করতে শেখে। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের মানুষ এই শিক্ষা পেয়েছে আরবদের কাছ থেকে। আরবদের মধ্যে কতিপয় বিখ্যাত মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। এঁদের মধ্যে আলকিন্দি নামক পণ্ডিত দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা-শাস্ত্র, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় দু'শ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অপর একজন আরবীয় পণ্ডিত ইবনে সেনা ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ও দার্শনিক। ইব্‌নে রোশেদ নামক জনৈক আরবীয় পণ্ডিত ইউরোপীয়দের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিলেন। ইবন ইশাথ নামে বিখ্যাত চিকিৎসক প্রাচীন গ্রীকদের চিকিৎসা সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁরই চেষ্টায় বিজ্ঞানী গ্যালেনের বই আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। আল-রাজি ছিলেন মুসলমান চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বসন্ত ও হাম রোগের চিকিৎসার উপর তাঁর লেখা একটি প্রামাণিক গ্রন্থ আছে। অনেক পরে, অবশেষে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বইয়ের মুদ্রণ অলকিণ্ডি পদার্থবিদ্যার উপর প্রায় ২৬২ খানি বই লিখেছিলেন। কোরানের উপর টীকা লিখে এবং আরবী ভাষায় কালানুক্রমিক প্রথম পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করে আলতিবারি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ইবন খালদুন ছিলেন অপর একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক।

আরবীয় পর্যটকদের মধ্যে আলবেরুণীর নাম প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত কিতাব-উল-হিন্দ্‌ গ্রন্থ থেকে হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন এবং ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

শিল্প-সাহিত্যে আরবদের অবদান: শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আরবদের অবদান স্মরণযোগ্য। শাহনামা রচয়িতা কবি ফিরদৌসী ছিলেন আরবীয় পণ্ডিত। ওমর খৈয়ামের বিখ্যাত 'রুবাই'গুলিও আরবদের সাহিত্য-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

স্থাপত্যবিদ্যায় আরবদের অবদানের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। সুরম্য প্রাসাদ, মসজিদ ও মিনারের

অপূর্ব গঠন-কৌশল ও চমৎকার কারুকার্যের মধ্যে আরবদের স্থাপত্য-বিদ্যার নিদর্শন মেলে। বাগদাদ, সমরখন্দ, কায়রো ও কর্ডোবা প্রভৃতি স্থানে আরব স্থাপত্যশিল্পের নানা নিদর্শন আজও বিদ্যমান। মিত্রাক্ষর কবিতা সর্বপ্রথম ইসলাম সাহিত্যেই রচিত হয়েছিল।

॥ অনুশীলনী ॥

১। **এক কথায় উত্তর দাও** ঃ

১। আরব দেশের যাযাবর মানুষদের এক কথায় কি বলে ?
২। হজরত মহম্মদ কোন ধর্ম প্রচার করেন ?
৩। ইসলামধর্ম যারা গ্রহণ করে তাদের কি বলে ?
৪। কোরান কি ?
৫। 'শূন্য' সংখ্যার ব্যবহার আরব পণ্ডিতেরা কাদের কাছ থেকে শেখেন ?
৬। আলকেমি কথার অর্থ কি ?
৭। শাহনামা কে রচনা করেছিলেন ?
৮। অমর খৈয়াম কে ছিলেন ?
৯। আল-রাজি কে ছিলেন ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরীভিত্তিক প্রশ্ন** ঃ

১। 'বেদুইন' কাদের বলা হয় ? তারা কি ভাবে বসবাস করত ?
২। হজরত মহম্মদ কে ছিলেন ? তিনি কখন, কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?
৩। মহম্মদ কি ভাবে সিদ্ধিলাভ করেন ? তাঁর ধর্মের মূল কথা কি ?
৪। মহম্মদ কেন মদিনায় পালিয়ে গিয়েছিলেন ?
৫। কত খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ মক্কা জয় করেন ? তাঁর মক্কা বিজয়ের ফল কি হয়েছিল ?
৬। মহম্মদ কত খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন ? তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব কে গ্রহণ করেন ?
৭। আরব সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি ?
৮। ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রধান কেন্দ্রগুলি কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় ?
৯। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের কি ছিল ?
১০। শিল্প-সাহিত্যে আরবদের অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
১১। 'ইসলাম' কথাটির অর্থ কি ?
১২। 'জিন' কি ? কেন তাদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা হতো ?

৩। **রচনাত্মক প্রশ্ন** ঃ

১। আরবদেশ ও তার জনগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের সমাজ-জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। হজরত মহম্মদের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। হজরত মহম্মদ কোন ধর্ম প্রচার করেন? তিনি কি ভাবে ধর্ম প্রচারের কাজে অগ্রসর হন? তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের মূল কথা কি?

৫। ইসলাম ধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করার কারণ কি?

৬। আরবদের সাম্রাজ্যবিস্তার সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ঐ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি?

৭। আরবে খলিফা শাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৮। হারুণ-অল-রসিদের শাসনকাল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৯। সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১০। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪। **সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ** ঃ

(ক) হিজরী, (খ) হাদিশ, (গ) কর্ডোবা, (ঘ) কারবালা, (ঙ) মহরম, (চ) আরব্য-উপন্যাস।

৫। **বিষয়মুখী প্রশ্ন** ঃ

শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

(ক) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন —।

(খ) হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন —।

(গ) — খ্রীস্টাব্দে হজরত মহম্মদ পরলোক গমন করেন।

(ঘ) খলিফাদের মধ্যে — ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

(ঙ) আব্বাসিদ খলিফাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন —।

(চ) ইসলাম সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল —।

(ছ) — রচয়িতা কবি ফিরদৌসী ছিলেন আরবীয় পণ্ডিত।

৬। **মৌখিক প্রশ্ন** ঃ

১। 'বেদুইন' কাদের বলে?

২। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে?

৩। আবুবকর কে ছিলেন?

৪। হিজরী সন কবে থেকে গণনা শুরু হয়?

॥ ৬ ॥ মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ
(আঃ ৮০০—১২০০ খ্রীঃ)

শার্লামেনের নেতৃত্বে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ভব ঃ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার পর ফ্রাঙ্ক নামে বর্বর জাতির এক শাখা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানির কতকটা অঞ্চল নিয়ে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। এই ফ্রাঙ্ক রাজ্যটি 'মেরোভিঞ্জিয়ান' নামক এক রাজবংশ স্থাপন করেছিল। এই বংশীয় রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে পিপিন নামে এক রাজকর্মচারী রাজক্ষমতা অধিকার করেন। কালক্রমে পিপিনের পুত্র চার্লস সম্রাট হলেন। 'শার্লামেন' চার্লস কথার ফরাসী রূপ।

শার্লামেন

শার্লামেন (৭৬০—৮১৪ খ্রীঃ) ঃ শার্লামেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। অসাধারণ যোগ্যতা ও গুণাবলীর জন্য তিনি চার্লস দি গ্রেট বা মহামতি চার্লস নামেও অভিহিত হতেন। তাঁর জনৈক বসচি অজিনহার্ডের লেখা চার্লস-এর জীবনীগ্রন্থ হতে শার্লামেন সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। শার্লামেন এক সম্ভ্রান্ত জার্মান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ৭৪২ খৃষ্টাব্দে। ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ বছর বয়সে তিনি ফ্রাঙ্কদের রাজা হন।

শার্লামেন ছিলেন সুপুরুষ, দীর্ঘাকৃতি ও অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী। তরবারির এক আঘাতে তিনি একটি অশ্ব ও অশ্বারোহীকে ধরাশায়ী করতে পারতেন। তাঁর উচ্চ নাসিকা, উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু, স্ফীত উদর, দীর্ঘ শ্মশ্রু যে-কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। চার্লস দিনরাত পরিশ্রম করতেন। বিশ্রাম কাকে বলে তা

তিনি জানতেন না। কাকেও অলস দেখলে তাকে তিরস্কার করতেন। সাধারণ পোশাক পরতে তিনি পছন্দ করতেন। একটি কোট আর রূপোর কাজ করা মোজা তিনি ব্যবহার করতেন। কোমরবন্ধে সব-সময় তলোয়ার শোভা পেত। লেখাপড়া না জানলেও তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ছিল অপরিসীম। সকলকে প্রশ্ন করে তিনি ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। তিনি ধর্ম বিষয়ে আলোচনা শুনতে ভালবাসতেন।

রাজ্যজয়ঃ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপের সর্বত্র যে বর্বরতা ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল শার্লামেন তা দূর করে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। পুনঃ পুনঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধযাত্রা করে শার্লামেন বর্তমান ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন ও ইতালির উত্তরাংশ এবং জার্মানির অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে তিনি ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন।

সারাজীবনে শার্লামেন অর্ধ শতের বেশী যুদ্ধ করেছেন। ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৮০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ছ'বার অভিযান করে আরব নামে এক বর্বর জাতিকে তিনি আয়ত্তে এনেছিলে। ব্যাভেরিয়ান রাজ্যটি তিনি জয় করেছিলেন। তাঁর সিংহাসন লাভের অল্পকালের মধ্যেই বর্বর লম্বার্ডগণ বার বার অভিযান করে ইতালিতে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। লম্বার্ডরাজ ডোসিডোরিয়াস রোমের দিকে অগ্রসর হলে রোমানরা নিরুপায় হয়ে শার্লামেনকে রোম দেশ রক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানায়। শার্লামেন এই অনুরোধে সাড়া দিয়ে লম্বার্ডরাজ্য আক্রমণ করলেন এবং লম্বার্ডরাজ্য পরাজিত করে সিংহাসন দখল করলেন। শার্লামেন স্যাক্সনদের সঙ্গেও সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ করেছেন। স্যাক্সনরা অন্য ধর্মাবলম্বী ছিল। তারা খৃষ্টান যাজকদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করত। তাদের গীর্জা বা ভজনালয় অগ্নিদগ্ধ করত, এমন কি সময় বিশেষে খৃষ্টান যাজকদের হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করত না। শার্লামেনের আদেশে একবার কয়েক হাজার স্যাক্সন বন্দী ও নিহত হয়েছিল। এতে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত স্যাক্সনরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এর পর শার্লামেন স্যাক্সনদের এলাকায়, রাস্তাঘাট, গীর্জা,

সেতু প্রভৃতি নির্মাণ এবং খৃষ্টান ধর্মযাজক পাঠিয়ে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

স্পেন দেশ থেকে আরবদের বিতাড়িত করতে শার্লামেন বদ্ধপরিকর ছিলেন। স্পেন দেশে একবার অশান্তির আগুন জ্বলে উঠে এবং স্পেনের শাসক সুলতান আবদুল রহমানের সঙ্গে দেশের অভিজাত ব্যক্তিদের মতবিরোধ দেখা দেয়। এই অভিজাত ব্যক্তিরা শার্লামেনকে স্পেন আক্রমণ করতে আমন্ত্রণ জানায়। শার্লামেন এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং স্পেন আক্রমণ করেন। যুদ্ধ চলাকালীন স্যাক্সনদের বিদ্রোহ ঘোষণা করার সংবাদ শার্লামেনের নিকট আসে। তিনি স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন। অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে শার্লামেন প্রথমে অগ্রসর হন। শেষ অংশ যখন একটি গিরিপথের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তখন আরবীয়রা হঠাৎ আক্রমণে তাহাদের সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে ফেলে। এই দলে ছিলেন ইতিহাস বিখ্যাত সেনাপতি শার্লামেনের ভ্রাতুষ্পুত্র রোল্যাণ্ড। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিহত হন। সংবাদ পেয়ে শার্লামেন যখন ফিরে আসেন তখন সব শেষ। আরবীয়দের সঙ্গে রোল্যাণ্ডের যুদ্ধ এবং তাঁর বীরত্ব ও আত্মত্যাগ কাহিনী নিয়ে 'সঙ্গস্ অব রোল্যাণ্ড' বা রোল্যাণ্ড গীতি রচিত হয়েছিল। মধ্যযুগের চারণগণ এই সব গীতি গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াত।

শার্লামেনের অভিষেক ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা : খৃষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরুকে বলা হয় পোপ। পোপ তৃতীয় লিও ছিলেন অতীব নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। ৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের সময় তিনি শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হন। শার্লামেন শত্রুদের আক্রমণ থেকে পোপ তৃতীয় লিওকে রক্ষা করেছিলেন। তাই ৮০০ খ্রীস্টাব্দে যীশুর জন্মদিনে শার্লামেন যখন সেণ্ট পিটার্স গীর্জায় প্রার্থনায় গিয়েছিলেন তখন পোপ তৃতীয় লিও হঠাৎ তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে তাঁকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই ঘটনার সময় উপস্থিত জনতা উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন—"মহান রোম সম্রাট চার্লস

অগাস্টাসের জয় হউক'। সেদিন থেকে শার্লামেনের সাম্রাজ্যকে বলা হয়ে থাকে 'হোলি রোমান এম্পায়ার' অর্থাৎ পবিত্র রোমক
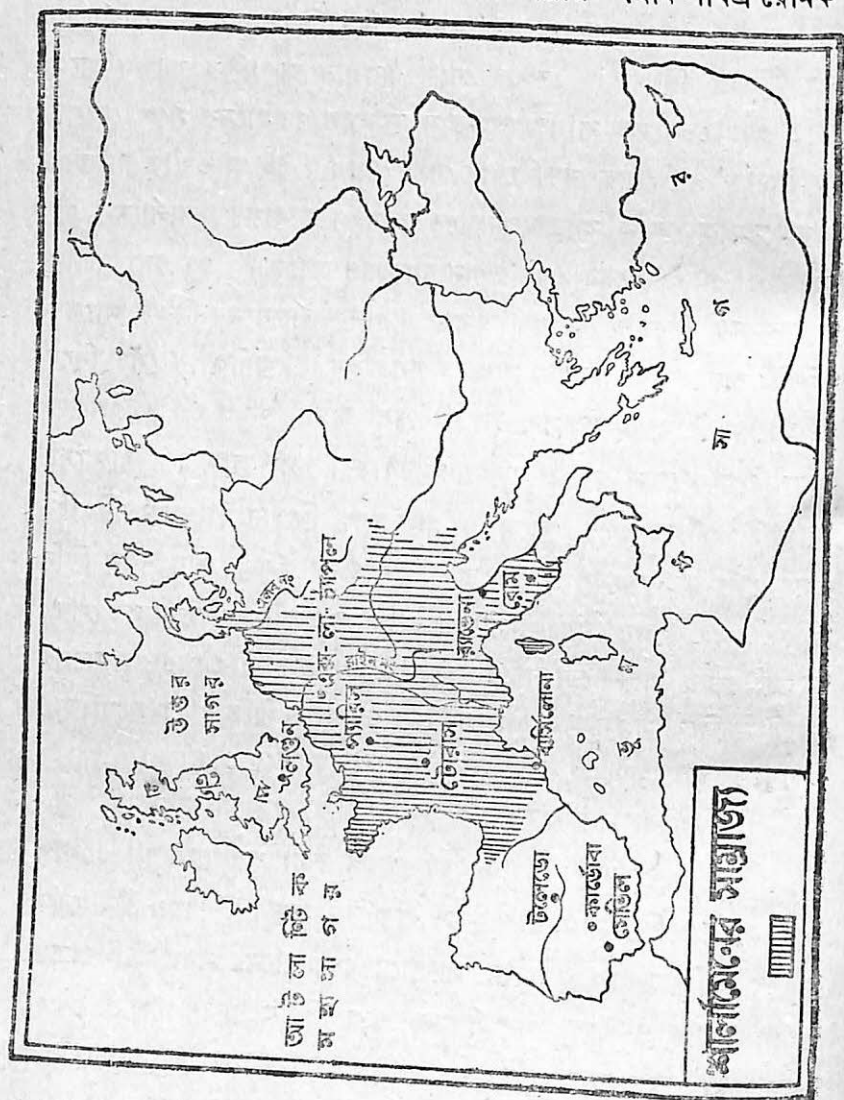
সাম্রাজ্য। এই সময় থেকে জনসাধারণ বিশ্বাস করতে থাকে যে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের পুনরায় উদ্ভব হয়েছে।

পোপ কর্তৃক শার্লামেনকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অনেক। এতে পুনরায় পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের উদ্ভব হলো

অর্থাৎ জার্মান বর্বরদের এক রাজার হাতে যেমন রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল, তেমনি জার্মানদের এক রাজা শার্লামেন-এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন।

শার্লামেনের শিক্ষা-ব্যবস্থা ঃ রোমের সম্রাট হওয়ার পর শার্লামেন রোমসাম্রাজ্যের পুরানো গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। জার্মানির একেন শহরে তিনি নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে বিদ্যাচর্চার জন্য একটি পরিষদ গঠন করা হয়। শার্লামেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে কৃতবিদ্য পণ্ডিত আনিয়ে এক পরিষদ গঠন করেছিলেন। ডেনদের আক্রমণে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত ইংরেজ পণ্ডিত অ্যালকুইন শার্লামেনের রাজসভায় বসবাস করতে থাকেন। অ্যালকুইনের চেষ্টায় রাজপ্রাসাদে বিদ্যালয় স্থাপিত হলো। এই বিদ্যালয়ে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা পড়তে পারত। অ্যালকুইনের পরামর্শে শার্লামেন রাজ্যের স্থানে স্থানে গীর্জা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইভাবে শার্লামেন ইউরোপের তথাকথিত অন্ধকার যুগে জ্ঞানের দীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।

রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে সম্পর্ক ঃ চার্চের প্রতি সম্রাটের মনোভাব মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শার্লামেন চার্চের উন্নতির জন্য যেমন বিপুল পরিমাণে অর্থ সাহায্য করেছিলেন, তেমনি চার্চের উপর নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতেও তার চেষ্টার বিরাম ছিল না। তিনি খ্রীষ্টধর্মের দুই স্তম্ভ-প্রথা অর্থাৎ চার্চ ও রাজশক্তির পৃথক ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রথাটি রহিত করে দেন। এর পরিবর্তে তিনি চার্চ ও রাজশক্তির মধ্যে সচেতন ঐক্যবন্ধন গড়ে তুললেন। এই ব্যবস্থা উভয়ের মধ্যে ফলপ্রসূ হয়েছিল।

শার্লামেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক ছিলেন। তিনি চার্চের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেই মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলের মানুষের মন যখন ধর্মবিশ্বাসে অটল, তখন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারা যে-কোন শাসকের পক্ষে অদূরদর্শিতা ছাড়া আর

কিছুই নয়। একথা ভেবে শার্লামেন ধর্মীয় মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর শাসনবিধি তৈরি করেছিলেন।

শার্লামেন চার্চের ব্যাপারে সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও অনেক সময় তিনি নিরপেক্ষ নীতি মেনে চলতেন। এটাই ছিল শার্লামেনের রাষ্ট্র-জ্ঞানের বিশেষত্ব। তাঁর ধর্মীয় নীতির অন্তরালে পার্থিব স্বার্থ লুকানো ছিল। তিনি রাজকীয় ক্ষমতার বিন্দুমাত্র অপচয় না করে চার্চের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব সুযোগ-সুবিধা আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে শার্লামেন চার্চের প্রতি উদার মনোভাব দেখিয়ে নিজের ক্ষমতা বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর এই আশা বাস্তবে পরিণত করতে হলে একজন উচ্চশিখিত, যোগ্য এবং অনুরক্ত যাজকের প্রয়োজন। শার্লামেনই-যে সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগ্য শাসক একথা তিনি কাউকে বুঝতে দেননি। তিনি নিজেকে পৃথিবীর ঈশ্বর বলে মনে করতেন। এছাড়া তিনি আরও মনে করতেন যে, তিনি একাধারে সমস্ত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রভু, পিতা, রাজা, পুরোহিত, নেতা ও পথপ্রদর্শক। শার্লামেন পোপকে রাজপুরোহিত বলে মনে করতেন এবং স্পষ্টই বলতেন, চার্চকে রক্ষা করা সম্রাটের কর্তব্য। অপরপক্ষে পোপের কর্তব্য হচ্ছে রাজার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। শার্লামেন মনে করতেন যাজকদের আচরণ-বিধির জন্য আইন প্রণয়ন প্রয়োজন। ধর্মীয় রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান-গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করাও তাঁর পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন।

পোপ ও সম্রাটের মধ্যে সম্পর্কঃ পোপের সঙ্গে সম্রাট শার্লামেনের সম্পর্ক প্রথম দিকে ভালই ছিল। পোপ ও গীর্জার প্রতি সম্রাটের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ছিল। পোপই শার্লামেনকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন, তাই পোপ নিজেকে সম্রাট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। শার্লামেন অসীম যোগ্যতাবলে চার্চের উপর তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে সাইনড্-এ সভাপতিত্ব করে পোপের

---

* রাষ্ট্রসমূহের সমস্যা ও ধর্মাধিষ্ঠানের মতানৈক্য দূরীকরণের প্রচেষ্টার জন্য রাষ্ট্র বা ধর্মাধিষ্ঠানের প্রধান বা প্রতিনিধিদের সভাকে 'সাইনড্' বলা হতো।

মর্যাদার ঊর্ধ্বে তাঁর মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই সাইনড্
পোপ তৃতীয় লিওকে তাঁর কার্যকলাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে।
এতে পোপের মর্যাদা খুবই ক্ষুণ্ণ হয়। অপর পক্ষে সম্রাটের মর্যাদা
বৃদ্ধি পায়। পোপ ছিলেন সম্রাটের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। পোপকে
দোষী প্রতিপন্ন করে সম্রাট অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হলেন।
পরবর্তী সম্রাটদের কাছেও পোপ দাবী করেছিলেন যে তিনি সম্রাট
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সম্রাটগণ তা স্বীকার না করায় পোপ ও
সম্রাটদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছিল।

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরূপে শার্লামেন:
শার্লামেনের সাম্রাজ্যের মধ্যে ইউরোপীয় দেশগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে
একটি সামগ্রিক ঐক্য গঠন করে। শার্লামেনের রাজত্বকালে নতুন
সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়। এই সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য-
চর্চার প্রসার ঘটে। এক কথায় বলা যায় যে শার্লামেনের রাজত্বকাল
ছিল প্রকৃতপক্ষে নবজাগরণের সূচনা-পর্ব। এই সময় রোমান
ঐতিহ্যের সঙ্গে ক্যারোলিঞ্জীয় ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটে এবং নবজাগরণের
দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

কবি বনিফেস এই সময়কালের একজন অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি।
তিনি সংস্কারমূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী ছিলেন।
যাজকদের মধ্যেও তিনি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। ফুলডা নামক
স্থানে তাঁর স্থাপিত একটি মঠ ছিল। এই মঠ সাহিত্য ও সংস্কৃতির
কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

শার্লামেন ব্যক্তিজীবনে শিক্ষার সুযোগ পাননি। কিন্তু সম্রাট-
রূপে শার্লামেন তাঁর সাম্রাজ্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ব্যাপক শিক্ষাসূচী
গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষার মান যাতে উন্নত হয় সেদিকে তাঁর বিশেষ
লক্ষ্য ছিল। তাঁর প্রাসাদ হয়ে ওঠে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এর
প্রভাব দেখা যায় বিভিন্ন মঠ ও বিশপের এলাকায়। শার্লামেন তাঁর
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পণ্ডিত ও ধর্মতাত্ত্বিকদের আহ্বান করে
নিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ইতালির পল দি ডেকন,

পিটার ও পলিনাস, স্পেনের বিখ্যাত কবি থিয়োডালফ এবং ইয়র্কের খ্যাতিমান পণ্ডিত অ্যালকুইন। অ্যালকুইন ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত ও আদর্শ শিক্ষক। ব্যাকরণে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মপুস্তক সংকলনের কাজ সম্পন্ন করেন। সন্ত বেনিডিক্ট প্রবর্তিত ধর্মনীতির মূল পাণ্ডুলিপি মন্টি ক্যাসিনো চার্চ থেকে তিনিই আনিয়েছিলেন।

বর্ণমালা সংস্কার ঃ অ্যালকুইনের অপর সংস্কারমূলক কাজ হল বর্ণমালার সংস্কার। তিনি মেরোভিঞ্জীয়দের অস্পষ্ট অক্ষরগুলির পরিবর্তন করে নতুন ধরনের হস্তাক্ষর প্রবর্তন করেন। নবজাগরণের সমকালে ইতালির পণ্ডিতগণ এই বর্ণমালাকেই সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। পাঠ্যপুস্তক যাতে সম্পূর্ণ নির্ভুল হয় সেদিকে সম্রাট শার্লামেনের প্রখর দৃষ্টি ছিল।

স্থাপত্য ও চিত্র-শিল্পের বিকাশ ঃ সম্রাট শার্লামেন স্থাপত্য ও চিত্র-শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রাসাদ ও গীর্জা নির্মাণে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেন।

ক্যারোলিঞ্জীয় শিল্পীরা বাইজানটাইন ও অন্যান্য মুসলিম শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মূর্তি নির্মাণ ও অলংকার শিল্পে এই যুগের শিল্পীরা যথেষ্ট উন্নত ছিল। তাদের শিল্পধারায় প্রাচীন শিল্পরীতির সঙ্গে নতুন শিল্পরীতির সমন্বয় করা যায়।

সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের মঠজীবন

মধ্যযুগে রাজা ও সামন্তশ্রেণী প্রধানতঃ যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকলেও সমাজে ধর্মের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইউরোপের অধিকাংশ লোক খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। তারা ধর্ম-যাজকদের খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। যাজকদের ক্ষমতাও ছিল অপরিসীম। সমাজে যাজকরাই ছিলেন একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়। তাঁরা লেখাপড়া জানতেন বলে তাঁদের 'ক্লার্ক' বলা হতো।

খৃষ্টান জগতের প্রধান ধর্মগুরু ছিলেন রোমের পোপ। সমগ্র ইউরোপের খৃষ্টানদের উপর এমনকি সম্রাটদের উপরও তাঁর আধিপত্য

ছিল। ধর্মীয় শাসন পরিচালনার জন্য তিনি সমগ্র খৃষ্টান সমাজকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। প্রত্যেক প্রদেশের যাজককে বলা হত আর্চ বিশপ। প্রত্যেক প্রদেশ কতকগুলি জেলায় বা ডায়োসেসে বিভক্ত ছিল। এর যাজককে বলা হতো বিশপ। প্রতিটি ডায়োসেসকে আবার কতকগুলি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এইসব বিভক্ত ভাগের যাজককে বলা হত প্রিস্ট।

যাজকদের মধ্যে দুটি ভাগ ছিল—বিশপ ও মঙ্ক। বিশপরা লক্ষ্য রাখতেন খৃষ্টান গৃহস্থগণ নিজ নিজ এলাকায় ধর্মাচারগুলি যথাযথ পালন করছে কিনা। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর যাজক মঠে থেকে শাস্ত্রপাঠ ও জপতপে নিযুক্ত থাকতেন। এঁদের বলা হোত 'মঙ্ক' বা 'সন্ন্যাসী' মঠের অধ্যক্ষকে 'আবট' বলা হতো। আবট যে-সকল নিয়ম-কানুন করতেন মঠবাসী মঙ্কদের সেগুলি কঠোরভাবে পালন করতে হত। পুরুষ মঙ্কদের মত স্ত্রী সন্ন্যাসীয় ছিল। তাদের 'নান' বা সন্ন্যাসিনী। বলা হতো। মঠে নানদের পৃথকভাবে থাকবার ব্যবস্থা ছিল।

এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী দেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে খ্রীষ্টধর্ম ও এই ধর্মের নীতি প্রচার করতেন। এঁদের বলা হত 'ফ্রায়ার'। ফ্রায়াররা কেবলমাত্র খ্রীষ্টধর্মের নীতি প্রচার করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, দেশের যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিত সে সব জায়গায় ফ্রায়াররা উপস্থিত থেকে জনসাধারণের ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। ফ্রায়াররা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে আহতদের সেবা-শুশ্রূষাও করতেন।

যাজকদের নিকট জনসাধারণ বহুভাবে উপকৃত হোত। যাজকরা হাসপাতাল তৈরি করে জনসাধারণের চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। নিরাশ্রয়, আর্ত ও দুঃস্থ ব্যক্তিরা যাজকদের কাছ থেকে মুক্ত হস্তে সাহায্য পেত। জনশিক্ষার ভারও যাজকরা নিয়েছিল। মঠগুলিতে লেখাপড়া, প্রার্থনা, স্তোত্রপাঠ ও ল্যাটিন ভাষার চর্চা হতো। যাজকগণ সকলেই যে সাধু ও পরোপকারী ছিলেন তা নয়, অনেকে অধঃপতিত জীবনযাপন করতেন। প্রথম দিকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার

মধ্যে জীবনযাপন করলেও শেষ পর্যন্ত বহু সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী বিলাসপ্রিয় হয়ে পড়ে এবং নৈতিক জীবনে ও কর্তব্য পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। কোন কোন যাজক প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ও অর্থ সঞ্চয় করে বিত্তশালী হয়ে উঠেছিলেন। অনেক বিশপ বা বড় যাজকদের বিশাল জমিদারীও ছিল।

মঠের এই দুর্নীতিপরায়ণ আচরণ বন্ধ করবার জন্য কয়েকজন সন্ন্যাসীর প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে জেরোম, অ্যামব্রোস ও অগাস্টিন-এর নাম উল্লেখযোগ্য। অগাস্টিন ছিলেন নিষ্ঠাবান যাজকদের মধ্যে অন্যতম। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্মের প্রধান সংস্কারকরূপে বেনেডিক্ট-এর নাম স্মরণযোগ্য। তিনি মঠের অসংযমী আচরণ এবং বিশৃঙ্খল আদর্শ ও অতি কঠোর জীবন-যাপনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন।

বেনেডিক্টের আদর্শ: বেনিডিক্টের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ সহযোগিতামূলক এবং সামাজিক। তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইতালির মন্টি কাসিনোতে একটি মঠ তৈরি করে সেখানে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। এই মঠের নিয়মশৃঙ্খলা মধ্যযুগের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হত। বেনেডিক্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেক সন্ন্যাসী তার মঠাধ্যক্ষের আদেশ পালন করবেন। পার্থিব সুখ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করবেন, পরিশ্রম ও প্রার্থনার দ্বারা কালাতিপাত করবেন, কেউ কিছু খেতে দিলেও মঠের অধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া তা খেতে পারবেন না। বাড়ি থেকে লেখা কোন চিঠি তাঁরা নেবেন না। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাঁর শয্যা গ্রহণ করবেন। একবার কোন আদেশ দেওয়া হলে তা আর প্রত্যাহার করা হবে না। কেউ যদি আদেশ অমান্য করেন তা হলে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া, চাবুক মারা অথবা মঠ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো।

সন্ন্যাসিনী

আত্মত্যাগ, সেবা, দরিদ্র-জীবনযাপন, শুচিতা, ধর্মানুবাততা ও বিদ্যাচর্চা ছিল বেনেডিক্ট সম্প্রদায়ের জীবনের আদর্শ।

মঠে জ্ঞানচর্চা ঃ সেণ্ট বেনেডিক্টের পর মঠের নিয়মকানুনের উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেন ক্যাসিওডোরাস নামে একজন বিদ্যোৎসাহী রাজকর্মচারী। সরকারী পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর ক্যাসিওডোরাস অ্যাপুলিয়ার অন্তর্গত স্কুইলেসে তাঁর পৈত্রিক বাসভূমিতে একটি মঠ স্থাপন করেন। ঐ মঠের দৈনিক কর্মসূচীতে বিদ্যাচর্চার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ইতালি ও উত্তর আফ্রিকা থেকে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় লেখা অসংখ্য পুরানো পুঁথিপত্র সংগ্রহ করে সেগুলি নকল করার দায়িত্ব দেওয়া হয় মঠবাসীদের উপর। পুঁথিগুলির সংকলন এবং শুদ্ধ ও অবিকৃতভাবে নকলের জন্য গভীর অধ্যাবসায় ও পড়াশুনার প্রয়োজন হতো। স্কুইলেস মঠে এই কারণে এক বিশাল গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। ক্যাসিওডোরাস ও তাঁর অনুগামীদের এই কাজের ফলে পুরানো আমলের অমূল্য গ্রন্থগুলি চর্চার অভাবে হারিয়ে যেতে পারেনি। মঠের অধীনে বিদ্যালয় স্থাপন করে তাঁরা সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে জ্ঞানচর্চার ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন স্কুইলেস ও অন্যান্য মঠের সন্ন্যাসিগণ।

ক্লুনির সংস্কার আন্দোলন ঃ নবম শতাব্দীতে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলে ইউরোপে সামন্ত প্রথার উদ্ভব ঘটে। সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির উপর ঐ প্রথার যে প্রভাব পড়েছিল তাতে মঠগুলির আদর্শ ও জীবনযাপন পদ্ধতিও অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছিল। মঠগুলিতে সামন্ত শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সামন্ত সর্দারগণ তাদের অন্যান্য সম্পত্তির মতই ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে এগুলি পরিচালনা করতে থাকেন। মঠের উন্নত জীবনাদর্শ এই ভাবে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়। অনেক সময় মঠের সঙ্গে সম্পর্কহীন গৃহী মানুষদের উপর মঠ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হত এবং তারা ধর্মীয় কার্যকলাপের চেয়ে পার্থিব লাভ-লোকসানের কথাই চিন্তা করতেন

বেশী। পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সংস্কারপন্থীরা সক্রিয় হয়ে উঠেন। বার্গাণ্ডির বেনেডিক্ট-পন্থী ক্লুনি মঠেই সর্বপ্রথম ব্যাপক সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

ক্লুনির মঠ ৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জন্মকাল থেকেই মঠটি সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সকল রকমের বন্ধন ছিন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছিল। কোন বিশপ এই মঠটি নিয়ন্ত্রণ করতেন না—এটি ছিল পোপের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রাধীনে। সুতরাং প্রথম থেকেই এই মঠ রাষ্ট্র ও চার্চের শাসনমুক্ত ছিল। পুরানো মঠগুলির উপর ক্লুনির কর্তৃত্ব স্থাপিত হলো এবং অনেক নতুন মঠও ক্লুনির শাখা হিসেবে গড়ে উঠল। সেণ্ট বেনেডিক্টের আমলে প্রত্যেকটি মঠ ছিল স্বয়ংশাসিত এবং তার নিজস্ব অধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষমতা ছিল। ক্লুনির শাখা মঠগুলিতে পৃথকভাবে কোন অধ্যক্ষ থাকতেন না। ক্লুনির নির্দেশ মতই তাঁদের শাসন পরিচালিত হতো। ক্লুনির প্রতিনিধিরা নিয়মিতভাবে ঘুরে ঘুরে সব কাজের তদারকী করতেন। এই-ভাবে মঠ পরিচালনায় একটি সুসংহত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে এক সময় ক্লুনির পরিচালনাধীনে তিন শত মঠ ছিল।

ক্লুনির মঠ

সেণ্ট বেনেডিক্টের আদর্শ ও নিয়মগুলির যথাযথ রূপায়ণ ছিল ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। অবশ্য কালোচিত কিছু কিছু নতুন নিয়মও যে প্রবর্তন করা হয়নি এমন নয়। যা হোক মঠবাসীদের সৎচিন্তা ও ব্রহ্মচর্য পালনে উৎসাহিত করা হয়েছিল। দৈহিক পরিশ্রম বিশেষ না করে ধর্ম-গ্রন্থপাঠ ও প্রার্থনার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

নির্বাচনের মাধ্যমে অধ্যক্ষ প্রভৃতি পরিচালকদের নিয়োগ প্রথা

স্বীকৃত হয়। সাধারণ লোকের মধ্যে মঠের যে সব সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়েছিল, সেগুলি পুনরুদ্ধার করে সন্ন্যাসীদের উপর দেখাশুনার ভার দেওয়া হয়েছিল।

ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ক্লুনির সন্ন্যাসীরা জনসাধারণের আস্থাভাজন হয়ে উঠে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকেই বিভিন্ন চার্চে বিশপ নিয়োগ করা হতে থাকে। এই রীতি সর্বপ্রথম লোরেনে প্রবর্তন করা হয়। এর পর থেকে চার্চকেও দুর্নীতিমুক্ত করতে আন্দোলন শুরু হয়। ক্লুনির সন্ন্যাসীদের অনুকরণে চার্চের পুরোহিত বা যাজকদেরও ব্রহ্মচর্য পালন অবশ্য কর্তব্য হয়ে উঠে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের কথা গৃহীত হয়। ফলে চার্চের উপর রাজা বা সামন্তদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি এতদিন ধরে বিদ্যমান ছিল তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার উপক্রম হল। একাদশ শতকে পোপ ক্লুনির আদর্শ মেনে নেওয়ায় রাজশক্তি ও চার্চের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের সূচনা হলো। এদিকে নতুন সংস্কার প্রবর্তনের ফলে চার্চ দুর্নীতিমুক্ত হয় এবং চার্চের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। এর পর চার্চ ধর্মের ব্যাপার ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তারে প্রয়াসী হলে রাজা ও সামন্তরা প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। বিশপের নিয়োগের সময় রাজা বা অধীনস্থ কোন সামন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে একটি আংটি ও ছোট ছড়ি তুলে দিয়ে দায়িত্ব ন্যস্ত করতেন। এই ব্যবস্থাকে তাঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ অধিকারের প্রতীক বলে মনে করতেন। চার্চ এই প্রথার বিরোধিতা করায় যে বিবাদের সৃষ্টি হয় তাকে 'ধর্মীয় দায়িত্ব অর্জনের যুদ্ধ' (Investiture Contest) বলে।

শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন

মধ্যযুগের ইউরোপে শিক্ষাচর্চার সুযোগ খুবই কম ছিল। শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহও বিশেষ ছিল না। চার্চ ও মঠগুলি ছিল সে যুগে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস অথবা চারুকলা

বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত এই দুই প্রতিষ্ঠানে। লেখাপড়া শেখায় আগ্রহী মানুষ এই সব প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে জ্ঞান আহরণ করত। সামন্ত রাজাদের সন্তানরা তাদের দুর্গের মধ্যে কোন বিদ্বান ব্যক্তির কাছে লেখাপড়া শিখত। তা'ছাড়া গিল্ডের প্রতিষ্ঠিত কারিগরী বিদ্যালয়েরও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।

দশম শতাব্দীর পর থেকে ইউরোপে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবনে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হলো। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও শহরগুলির উৎপত্তি নগর সভ্যতার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করল। রুজি-রোজগারের আশায় মানুষ দলে দলে শহরে এসে বসবাস শুরু করতে লাগল। এত লোকের চাকরির সংস্থান শহরে ছিল না। তাই মানুষ বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করতে চাইল। সে যুগে আইনের পরামর্শদাতা এবং ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনায় অভিজ্ঞ লোকের খুব প্রয়োজন ছিল। তা'ছাড়া হিসাবরক্ষক ও রাজকার্য চালাবার জন্যও শিক্ষিত মানুষের খুব সমাদর ছিল। শিক্ষিত কারিগরের চাহিদাও খুব ছিল। এত অধিকসংখ্যক মানুষকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চার্চ অথবা মঠে ছিল না। ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের ফলে মঠগুলিতে শিক্ষাচর্চার চেয়ে ধর্ম সাধনার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করায় মঠের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মানও খুবই নেমে যায়। তখন গীর্জাসংলগ্ন বিদ্যালয়গুলি শিক্ষাদানের একমাত্র কেন্দ্র হয়ে উঠে।

এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে মধ্যযুগে বিশেষ ধরনের শিক্ষাদানের প্রয়োজনেই বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছিল। যখন একদল ছাত্র বা শিক্ষক শিক্ষাগ্রহণ বা শিক্ষাদানের জন্য একত্রে সমবেত হতেন তখনই বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হতো। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করার জন্য পোপ ও সম্রাটের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল। একটি পৃথক সনদের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আইনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সনদে ছাত্রদের বিশেষ অধিকার দান করা হয়। সেই অধিকার অনুসারে ছাত্ররা সামরিক কাজ থেকে অব্যাহতি পায়।

মধ্যযুগে দুটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় বোলাগ্‌না এবং প্যারিস শহরে। বোলাগ্‌না বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে একটি শহর গড়ে উঠে। এখানে ছাত্রদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট আবাসগৃহ ছিল না। ছাত্ররা এই অবস্থার প্রতিকার করার চেষ্টা করে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সর্বাপেক্ষা উন্নত। এটি ছিল ঈশ্বরতত্ত্ব অধ্যয়নের কেন্দ্র।

মধ্যযুগে ইংলণ্ডে প্রথমে অক্সফোর্ড ও কিছুকাল পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রাগ শহর হতে কিছু সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক জার্মানির লাইপজিক শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। শিক্ষার প্রধান বিষয় ছিল গ্রীক-সাহিত্য ও দর্শন, রোমান আইন এবং খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ব।

কতিপয় বিখ্যাত অধ্যাপকঃ মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকতা করে যেসব পণ্ডিতব্যক্তি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁরা যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। এদের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা পড়াশুনা করতেন তাঁদের 'স্কুল-মেন' বলা হত। এই স্কুল-মেনদের অবদান ছিল গভীর এবং এদের এক-একজন অনেকগুলি বিষয়ের চর্চা করতেন। অধ্যাপক অ্যাবেলার্ডের বক্তৃতা শোনার জন্য এখানে হাজার হাজার ছাত্রের সমাবেশ হতো বলেই প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের ন্যায় তিনিও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্রদের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে চলতেন বলে অ্যাবেলার্ডকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। অ্যাবেলার্ডের বিখ্যাত বই-এর নাম 'হ্যাঁ ও না'। এতে অনেক তর্ক-আলোচনা আছে।

আলকার্টস ম্যাগনাস ছিলেন জনৈক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বাইবেলের কথা অবজ্ঞা করে তিনি উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের উপরে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। গোঁড়া খৃষ্টান সম্প্রদায় তাঁকে নাস্তিক আখ্যা দিয়েছিলেন কিন্তু ম্যাগনাস নির্ভয়ে তাঁর মত প্রচার করতেন।

ম্যাগনাসের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন **টমাস** একুইনাস। ইতালির নেপলস্ শহরে তাঁর জন্ম হয়। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। প্রথমে নেপল্স বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল পড়াশুনা করার পর একুইনাস প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই উপাধি লাভ করেন। মাত্র একুশ বছর বয়সে একুইনাস প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পাণ্ডিত্যের জন্য স্বয়ং পোপ তাঁকে পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **রবার্ট গ্রোসেটিস্ট** দর্শনশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। রোজার বেকনও ছিলেন অক্সফোর্ডের অধ্যাপক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতিকে কাজে লাগাতে পারে। দৃষ্টিবিজ্ঞানের উপর তাঁর গবেষণা থেকেই পরবর্তীকালে চশমা, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছিল। ভূ-বিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যায়ও রোজার বেকনের অবদান ছিল। সেই যুগের জনগণ বেকনের এই বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহ ভাল চক্ষে দেখেনি। শয়তানের শিষ্য মনে করে তাকে চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

মধ্যযুগে ইউরোপে দেশীয় ভাষায় দু'জন কাব্য লিখে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ইতালির কবি দান্তে এবং অপর জন ইংলণ্ডের কবি চসার।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ঃ মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ছাত্র-শৃঙ্খলার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হত। ছাত্ররা শিক্ষকের কথা মন দিয়ে শুনত এবং সব কিছু শিখবার চেষ্টা করত। ছাত্রদের পক্ষে বিলাসিতা করা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। শিক্ষকের কাজও ছিল খুবই শ্রমসাপেক্ষ। প্রতিদিন তাঁকে পড়াতে হত, অনুপস্থিত হওয়ার সুযোগ বিশেষ ছিল না। সাধারণ ভাবে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। পরীক্ষায় সফল ছাত্ররা শিক্ষককে আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিতে অনুরোধ করত, শিক্ষকও সানন্দে ছাত্রদের উৎসবে যোগ দিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে চার কিংবা পাঁচ বছর পড়বার পর ছাত্ররা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্নাতক হতেন। স্নাতক পর্যায়ে প্রধান পাঠ্যবস্তু ছিল ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন। এছাড়া ব্যাকরণ, অলংকার-শাস্ত্র, গণিত, সংগীত প্রভৃতি বিষয় পড়ানো হত। বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের জন্য আইন, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতিও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এইভাবে সুশিক্ষিত একদল যুক্তিবাদী মানুষ প্রতি বছর কর্মজগতে প্রবেশ করত। এই সব মানুষের প্রচেষ্টাতেই মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের মনে জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠেছিল। সুতরাং বলা যায়, মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই আধুনিক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার প্রথম পথপ্রদর্শক।

॥ অনুশীলনী ॥

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

১। শার্লামেন কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন ?
২। 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য' কে পুনরুদ্ধার করেন ?
৩। খৃষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরুকে কি বলা হয় ?
৪। শার্লমেনের মাথায় কে সোনার টুপী পরিয়ে দেন ?
৫। অ্যালকুইন কে ছিলেন ?
৬। বেনেডিক্ট কে ছিলেন ?
৭। ক্লুনির সন্ন্যাসীদের কি বলা হত ?
৮। 'ধর্মীয় দায়িত্ব অর্পণের যুদ্ধ' বলতে কি বোঝ ?
৯। মধ্যযুগে ইউরোপে যে দুইজন কবি দেশীয় ভাষায় কাব্য লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাহাদের নাম বল। তাঁরা কোন দেশের লোক ছিলেন ?
১০। বেনেডিক্ট সম্প্রদায়ের জীবনের আদর্শ কি ছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। শার্লামেনের অভিষেক উৎসব কোথায়, কি ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল ?
২। চার্চের সঙ্গে শার্লামেনের সম্পর্ক কেমন ছিল ?
৩। মঠের পবিত্র জীবনযাত্রা কি ভাবে কলুষিত হলো ?
৪। বেনেডিক্ট কে ছিলেন ? তাঁর আদর্শ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৫। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয় কেন গড়ে উঠল ?
৬। মধ্যযুগে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কিরূপ ছিল ?
৭। শার্লামেনের সময় রোমের পোপ কে ছিলেন ?
৮। শার্লামেন কিভাবে রোমের সম্রাট হন ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। 'পবিত্র রোমান' সাম্রাজ্য কথাটির অর্থ কি? শার্লামেন কিভাবে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।
২। পবিত্র রোমান সম্রাটরূপে শার্লামেনের অভিষেকের তাৎপর্য আলোচনা কর।
৩। শার্লামেন ও চার্চের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় কেন?
৪। ইউরোপে শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চায় শার্লামেনের অবদান কি ছিল?
৫। ইউরোপীয় মঠগুলির উৎপত্তির ইতিহাস লেখ। সেণ্ট বেনেডিক্টের নিয়মাবলী মঠের জীবনযাত্রায় কি পরিবর্তন এনেছিল?
৬। খৃষ্টান মঠে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা কিভাবে জীবনযাপন করতেন তার বর্ণনা দাও।
৭। ইউরোপীয় মঠগুলির সংস্কারের প্রয়োজন হয়েছিল কেন? ক্লুনির মঠের সংস্কার-পরিকল্পনা বর্ণনা কর।
৮। জ্ঞানচর্চায় মঠের ভুমিকা কি ছিল? চার্চের উপর ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব বর্ণনা কর।
৯। কি কি কারণে ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উৎপত্তি হয়েছিল? এর আগে ইউরোপে শিক্ষালাভের কিরূপ সুযোগ ছিল?
১০। মধ্যযুগে খ্যাতনামা কয়েকজন শিক্ষাবিদের পরিচয় দাও।
১১। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন কিভাবে পরিচালিত হতো?
১২। মধ্যযুগে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কেমন ছিল?
১৩। মধ্যযুগের ইউরোপে শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ

(ক) পোপ তৃতীয় লিও, (খ) কবি বনিফেস; (গ) অ্যালকুইন (ঘ) ক্লুনি, (ঙ) আলবার্ট ম্যাগনাস, (চ) টমাস একুইনাস।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(ক) ক্লুনির মঠ — খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল।
(খ) মধ্যযুগে দুটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় — এবং শহরে।
(গ) মধ্যযুগে ইংলণ্ডে প্রথম —— ও কিছুকাল পরে —— বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।
(ঘ) — — ছিলেন জনৈক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক।

———

মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

সামন্ততন্ত্র ঃ

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজনৈতিক দিক থেকে ইউরোপের সর্বত্র এক অন্ধকার যুগ নেমে এলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্রমশ উন্নত ভাবধারার বিকাশ হতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্যোগময় এক অবস্থা ইউরোপের ইতিহাসে কয়েক শ' বছর ধরে চলে। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে ইউরোপের জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা বলে কিছুই ছিল না। এই সুদীর্ঘ সময় ইউরোপের মানুষ যুদ্ধবিগ্রহ করেই কাটিয়ে দিয়েছিল। এত বড় দুর্যোগের দিনে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য স্থাপন করে শার্লামেন ইউরোপের শান্তি ও শৃঙ্খলার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সেরূপ যোগ্যতার পরিচয় কেউ দিতে না পারায় আবার শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি হয়। নর্স, ম্যাগিয়ার, শ্লাভ প্রভৃতি জাতির আক্রমণে ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট দিন দিন বাড়তে থাকে। অবশেষে তারা নিরুপায় হয়ে বাঁচবার তাগিদে ক্ষমতাবান লোকের আশ্রয় খুঁজতে থাকে। এই ক্ষমতাবান জনগণই ছিলেন দেশের জমিদারশ্রেণী। তাঁদের নেতৃত্বে ইউরোপের জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব হলো। এই নতুন ব্যবস্থাকেই বলা হয় সামন্ত প্রথা। এই প্রথা ইউরোপে প্রায় চার শ' বছর চালু ছিল। অর্থাৎ ইউরোপীয় সাম্রাজ্য সৃষ্টির শেষ প্রচেষ্টা এবং পশ্চিম ইউরোপে জাতীয় রাজতন্ত্রের উদ্ভবকালের মধ্যবর্তী যুগই ছিল 'সামন্ততন্ত্রের যুগ'।

সামন্ত প্রথার বৈচিত্র্য ঃ নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের অধিকাংশ দেশে সামন্ত প্রথার উদ্ভব হলেও প্রত্যেক দেশে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। ফরাসী দেশে এই প্রথার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটেছিল এবং সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে ইতালি ও জার্মানিতে এই প্রথার পরিবর্তন হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ইতালি কিংবা জার্মানিতে এই

প্রথার যেসব লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছিল, সেগুলি ফ্রান্সের সামন্ত-প্রথা থেকে বহুলাংশে পৃথক ছিল। কোন দেশে সামন্তপ্রথা প্রচলিত থাকলেও সেখানকার যাবতীয় জমি বা প্রতিটি অধিবাসী এই প্রথার অধীন ছিল না। ফ্রান্স বা জার্মানির কোন কোন জমির মালিক সামন্তবিশেষের প্রজা ছিলেন না। তা'ছাড়া ইংলণ্ড, সিসিল প্রভৃতি দেশে যে সামন্তপ্রথা বিকাশ লাভ করেছিল তার প্রত্যেকেরই নিজস্ব রূপ ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা ঃ রাজনৈতিক বিচারে সামন্তপ্রথাকে বলিতে হয় মধ্যযুগের স্বাভাবিক শাসনপদ্ধতি। কিন্তু সামন্ততন্ত্র কেবলমাত্র কতিপয় ক্ষমতাবান লোকের ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপার ছিল না। সামন্ততন্ত্রে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে তার মূলে ছিল বিশেষ এক ধরনের ভূমিব্যবস্থা এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক। এই ব্যক্তি-সম্পর্ক গড়ে উঠে কোন এক মালিকের জমি আর এক জন কর্তৃক চিরস্থায়ী শর্তে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। জমির মালিক কখনও নিজে জমিতে চাষ করত না। আবার যে জমি চাষ করত সে জমির মালিক ছিল না। নির্দিষ্ট শর্তে চুক্তি করে মালিকের কাছ থেকে চাষী চাষের জমি জমা নিত। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী চাষী ভূস্বামীকে শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করত, অর্থাৎ বিচার-ব্যবস্থা চালু রাখতে এবং প্রয়োজন মত যুদ্ধ করতে বা যুদ্ধে সৈন্য যোগান দিতে সে বাধ্য থাকত। চুক্তি অনুযায়ী চাষীর যুদ্ধ করা বা সৈন্য যোগানের দায়িত্ব থাকায় সামন্ততন্ত্র এক ধরনের সামরিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। সামন্ত ভূস্বামীরা প্রায়ই এই সৈন্যদলকে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করত।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিসম্পর্ক ঃ সমাজতন্ত্রে জমিবণ্টনের ভিত্তিতে মালিকের সঙ্গে চাষীর ব্যক্তিগত নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে উঠে। সামন্তসমাজে ভূস্বামীরা এভাবে এমন এক জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে যে, একজন প্রধান ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গোটা সমাজব্যবস্থা আবর্তিত হতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়

নীতিগতভাবে রাজাই ছিলেন সবার উপরে। দেশের যাবতীয় জমি বন, নদী, পশুচারণ-ক্ষেত্র সবই রাজার মালিকানাধীন। রাজা এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ব্যক্তিকে চুক্তির মাধ্যমে ভোগ-দখলের জন্য বন্দোবস্ত দিতেন। এসব জমির মালিক আবার তাদের অনুগত কিছু লোককে নির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে সেইসব জমির কিছুটা অংশ বন্দোবস্ত দিত এবং বাকি জমি সরাসরি নিজেদের প্রয়োজনের জন্য রেখে দিত। এইভাবে ধাপে ধাপে জমির মালিকানা ও ভোগদখলের বিষয়টি রাজার স্তর থেকে শুরু করে ক্রমেই নীচের স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। প্রতিটি স্তরের মালিক ও ভোগ-দখলকারীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে যে বোঝাপড়া ও চুক্তি হতো সেটাই ধাপে ধাপে বিন্যস্ত হয়ে এক পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

সামন্তযুগে ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ: সামন্ত ব্যবস্থায় সকলের উপরে ছিলেন রাজা। তিনি ছিলেন দেশের সমস্ত জমির মালিক। দেশের সমস্ত জমি রাজা বড় বড় প্রজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলি-বন্দোবস্ত করে দিতেন। এর বিনিময়ে রাজাকে তাঁরা নগদ অর্থ না দিয়ে যুদ্ধের সময় সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্য করতেন। বড় বড় জমিদাররা, আবার এইরূপ শর্তেই তাঁদের জমি ছোট ছোট জমিদারদের মধ্যে বন্দোবস্ত দিতেন।

বড় বড় ভূস্বামীদের বলা হোত ডিউক বা আর্ল। বংশপরম্পরায় জমির মালিকানা ভোগ করতে থাকায় তাঁরা জন্মসূত্রে নিজেদের অভিজাত বলে দাবী করতেন। রাজাকে তাঁরা তাঁদের সমগোত্রীয়দের মধ্যে প্রধান বলে মনে করতেন। সুযোগ এলেই ডিউকদের মধ্যে কেউ কেউ সিংহাসনের দাবীদার হয়ে উঠতেন। সেকালে এঁদের বলা হোত সেইনর বা জ্যেষ্ঠ কিংবা অগ্রগণ্য পুরুষ। সেইনর যাঁদের মধ্যে জমি বন্দোবস্ত দিতেন তাদের বলা হত ভ্যাসাল। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ভ্যাসালকে সেইনরের সামনে হাঁটু ভেঙ্গে বসে আনুগত্য জ্ঞাপন করতে হোত। ডিউক বা আর্লের ঠিক পরবর্তী নীচের স্তরের সামন্ত প্রভুদের বলা হোত ব্যারণ। সর্বনিম্ন স্তরের সামন্ত প্রভুদের বলা হোত নাইট।

এইভাবে ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্তরে জমির মালিকানা ও ক্ষমতা বিন্যস্ত হয়েছিল। প্রত্যেক স্তরের সামন্ত প্রভুরা ছিলেন একই সঙ্গে সেইনর ও ভ্যাসাল। অর্থাৎ একই ব্যক্তি ছিলেন অপেক্ষাকৃত ছোট মালিকের সেইনর বা প্রভু এবং অপেক্ষাকৃত বড় মালিকের কাছে ভ্যাসাল বা আশ্রিত। এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সবার উপরে ছিলেন রাজা—ইনি শুধুই সেইনর বা প্রভু, কারো ভ্যাসাল বা আশ্রিত নন।

সামন্তযুগে সামন্ত প্রভু ও প্রজার সম্পর্ক ঃ সামন্ত প্রথার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব হলো সামন্ত প্রভু ও প্রজার পারস্পরিক নির্ভরতা। জমি-প্রাপ্তি সূত্রে প্রজা তার প্রজার প্রতি অনুগত থাকার শপথ গ্রহণ করত এবং নিজেকে প্রভুর সেবায় নিয়োজিত করত। অপর পক্ষে সামন্তপ্রভুও বিপদে-আপদে প্রভুকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিতেন। চুক্তি রক্ষার দায়িত্ব ছিল প্রভু ও প্রজা উভয়ের। এক পক্ষ চুক্তি অমান্য করলে অপর পক্ষ তার দায় থেকে মুক্তি পেত। প্রভুর আদেশ পালন না করলে প্রজার কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া যেত, আবার প্রভু শর্ত পালন না করলে শক্তিমান প্রজা তার আনুগত্য অস্বীকার করতে পারত।

সামন্ত প্রজাকে নানাবিধ দায়িত্ব পালন করতে হতো। সামন্ত প্রভুর পক্ষ হয়ে তাকে যুদ্ধ করতে হতো। অপরাধীর বিচারের সময় প্রভুর নির্দেশে তাকে উপস্থিত হয়ে পরামর্শ দিতে হতো। যে-কোন ব্যয়সাধ্য কাজে প্রভুকে অর্থ যোগান দেওয়া প্রজার অবশ্য কর্তব্য ছিল। প্রজার কাছ থেকে পাওয়া এই অর্থকে গর্বিত সামন্ত কখনই 'কর্' বলে স্বীকার করতেন না। 'সেবা' নাম দিয়ে তাঁরা এতে মহত্ত্ব আরোপের চেষ্টা করতেন। এ ছাড়াও উত্তরাধিকার লাভ, বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে সামন্ত প্রভু প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতেন। পিতার সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায় জন্য পুত্রকে সামন্ত প্রভুর অনুমতি নিতে হতো। এই অনুমতি লাভের জন্য সামন্ত প্রভুকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিতে হতো। কোন প্রজার মৃত্যু হলে তার

উত্তরাধিকারী যতদিন নাবালক থাকত ততদিন সামন্ত প্রভু নাবালকের অভিভাবক হিসাবে সম্পত্তি তদারক করতেন এবং আয় ভোগ করতেন। মৃত প্রজার সন্তানদের বিবাহ দেবার অধিকার ছিল সামন্ত প্রভুর। এই বিবাহে অনুমতি দেবার জন্য সামন্ত প্রভু প্রচুর অর্থ আদায় করতেন।

সামন্ত প্রথার ঐতিহাসিক গুরুত্ব : সামন্ত প্রথায় নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এর যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল। মধ্যযুগে সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সামন্ত প্রথার বিকাশ হয়েছিল। এই প্রথার প্রভাবে অরাজকতা থেকে সম্মানের উদ্ভব হয়েছিল। রাজা ও সামন্তদের দরবারে জুরীর মাধ্যমে বিচার এবং আইনের বিচার ছাড়া জীবন ও সম্পত্তিনাশ বন্ধ করার নীতি প্রচলিত হয়েছিল। মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্বের মর্যাদার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সামন্ত প্রথা মধ্যযুগে এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেছিল।

সামন্ত দুর্গ : সামন্ত প্রথার যুগে ইউরোপে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। সামন্তগণ নিজেদের অধিকার বিস্তারের আশায় পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। এই যুদ্ধকে তারা 'অধিকার রক্ষার যুদ্ধ' বলে অভিহিত করতেন। যুদ্ধ করাকে তারা ন্যায়সংগত অধিকার বলে মনে করতেন। যুদ্ধকালে প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য দুর্গগুলি তৈরি হয়েছিল। পাহাড়ের চূড়া অথবা কোন নদীর অবস্থান দুর্গ নির্মাণের আদর্শ স্থান হিসেবে বিবেচিত হতো। প্রথম দিকে দুর্গ তৈরি করা হতো বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে। পরে পাথরের দুর্গ তৈরির প্রচলন হয়। দুর্গগুলি খুবই সুরক্ষিত ছিল। দুর্গের চারদিকে খনন
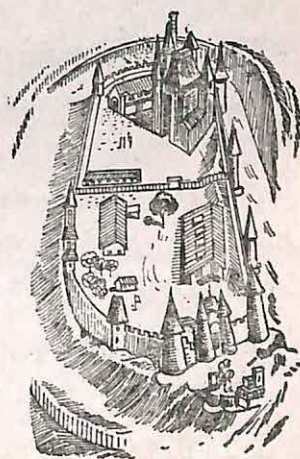
সামন্ত দুর্গ

করা হতো গভীর পরিখা বা খাল। ঝুলন্ত একটি সেতুর সাহায্যে দুর্গ থেকে বাইরে যাতায়াতের সুবিধা ছিল। দুর্গের প্রধান ফটক তৈরি হতো লোহা দিয়ে। দীর্ঘকাল বাস করার উপযোগী খাদ্য ও পানীয় সেখানে মজুত থাকত। দুর্গের মধ্যে সবচেয়ে দুর্গম ও অস্বাস্থ্যকর জায়গায় তৈরি হতো বন্দীশালা। সেখানে ছোট ছোট ঘরে শিকল দিয়ে বন্দীদের বেঁধে রাখা হতো। দুর্গের ভেতরে কোন উঁচু জায়গা থেকে সহজেই শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা যেত। দুর্গের ভিতরে সৈন্যরা নিরাপদ দূরত্ব থেকে শত্রুকে প্রতিহত করতে পারত। দুর্গের প্রধান গম্বুজের নীচে থাকত ঘোরানো সিঁড়ি। সেটা নেমে যেত একটা সুড়ঙ্গ পথের মুখে। প্রয়োজন বোধে সামন্ত প্রভু তাঁর পরিজনসহ নিরাপদে দুর্গ থেকে বের হতে পারতেন।

শত্রুকে বাধা দেওয়া ছাড়া শান্তির সময়েও দুর্গের ভূমিকা ছিল। দুর্গই ছিল সামন্তদের কর্মকেন্দ্র। এখানে ছিল তাদের বিচারালয় এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব ও যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে সামন্তরা সপরিবারে দুর্গমধ্যে বাস করতেন।

সামন্তপ্রভু ও তাঁদের যোদ্ধারা সব সময় অস্ত্রসাজ্জত হয়ে থাকত। চাষী ও সাধারণ মানুষ ছিল একেবারে নিরস্ত্র। মধ্যযুগের সামন্ত শাসকদের এই অস্ত্রসজ্জার দুটি সম্ভাব্য কারণ অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ সামন্ত-প্রভুরা অনবরত প্রতিবেশী সামন্তদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন ; তাই আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রসজ্জার প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ চাষী ও মেহনতী মানুষকে শোষণ করেই সামন্তপ্রভুরা বেঁচে থাকতেন। এই শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এরা যাতে বিদ্রোহী না হয়ে উঠতে পারে এবং তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের জন্যই ছিল এই অস্ত্রসজ্জা।

বর্ম-পরা অশ্বারোহী সৈনিক : মধ্যযুগে অশ্বারোহী সৈনিকের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামন্ত-প্রভু ও যোদ্ধারা প্রায় সকলেই ছিলেন অশ্বারোহী। শত্রুর অস্ত্রাঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে-যুগে আরোহী ও অশ্বের দেহের প্রধান অংশগুলি বর্ম দিয়ে ঢেকে রাখা

হোত। প্রথম দিকে মোটা চামড়া দিয়ে এই বর্ম তৈরি হোত। পরে 'ক্রস-বো' নামক ধনুকের প্রচলন হলে যোদ্ধার সামনের দিক ঢেকে রাখার জন্য বর্মের উপর একটা লোহার পাত ঝুলিয়ে দেওয়া হোত। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে সর্বাঙ্গ ঢাকা লোহার বর্ম পরার রীতি প্রবর্তিত হয়। এছাড়া এদের মাথায় থাকত যেমন লোহার শিরস্ত্রাণ, তেমনি চোখের খোলা অংশে এমন ভাবে ইস্পাতের পাত বসানো থাকত যে, দরকার মত টেনে শুধু চোখ খোলা রেখে মুখের সবটাই আড়াল করা যেত। আত্মরক্ষার জন্য যোদ্ধার হাতে ঘুড়ির আকৃতি-বিশিষ্ট ছোট ঢাল থাকত। বর্শা ছিল প্রধান অস্ত্র, তবে তরবারি ও ছোরা ব্যবহার হত। বন্দুক ও বিস্ফোরক আবিষ্কারের আগে বর্মপরা অশ্বারোহী সৈনিকের কৃতিত্বেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হতো। তুর্কী আক্রমণ থেকে কনস্টান্টিনোপল রক্ষায় এবং ধর্মযুদ্ধে ইউরোপীয় অশ্বারোহী যোদ্ধাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

সামন্তযুগে ইউরোপের জীবনযাত্রা ঃ মধ্যযুগের ইউরোপীয় জীবনযাত্রায় সামন্ত-প্রথার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। সামন্তগণ মাঝে মাঝে দুর্গের ভিতরে থাকতেন। আর বেশীর ভাগ সময় অধীনস্থ প্রজাদের নিয়ে গ্রামের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বাস করতেন। গ্রামের খামারবাড়িকে বলা হতো ম্যানর। চাষীরা খামারবাড়িতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করত। তারপর সন্ধ্যা হলেই খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

সে যুগে বাসগৃহ তৈরি করার সময় আলো-বাতাসের ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজনীয়তা বা স্বাস্থ্যরক্ষার কথা আদৌ ভাবা হোত না। ফলে ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণীর বাসগৃহ হোত স্যাঁতসেতে ও অন্ধকারময়। ঘরের মেঝে সাধারণত খোলাই থাকত, তবে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার সময় মেঝেতে খড় বিছানো হোত। কার্পেট বিছানোর রীতি অনেক পরে প্রচলিত হয়েছিল। সেযুগে ইউরোপীয়দের বাসগৃহে বিশেষ আসবাবপত্র রাখা হোত না। শোয়ার জন্য উঁচু কাঠের তৈরি খাট, কয়েকখানা সাধারণ চেয়ার ও সিন্দুক ছিল প্রধান আসবাব দ্রব্য।

ধনী-দরিদ্র সকলেই ভোজনবিলাসী ছিলেন। খাদ্যের প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু বৈচিত্র্য ছিল না। খাদ্য-সামগ্রী সাধারণ ভাবে রন্ধন করা হোত। ধর্মযুদ্ধের পর মসলাযোগে খাদ্যসামগ্রী সুস্বাদু করবার ব্যবস্থা ব্যবস্থা হয়। সাধারণভাবে যে সব সব্‌জি ব্যবহার করা হোত মধ্যে বাঁধাকপি, গাজর, পেঁয়াজ, মটরশুঁটি ও ওলকপি উল্লেখযোগ্য। ফলমুলের মধ্যে কিসমিস ও জামজাতীয় ফল ছিল প্রধান। খাদ্যের প্রধান উপাদান ছিল মাছ ও মাংস। পানীয়রূপে চা ও কফির ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। পানীয়রূপে মদ্যের ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

রাত্রে আলো জ্বলত একমাত্র ধনীর গৃহে। মোমবাতির ব্যবহার বিলাসিতার অঙ্গ বলে বিবেচিত হোত।

সে যুগে মানুষের জীবনে আমোদ-প্রমোদের বিশেষ সুযোগ ছিল না। চার্চের নিষেধ অমান্য করে কেউ কেউ পাশা খেলত।

মধ্যযুগে অভিজাতগণ প্রায় সকলেই ছিলেন দক্ষ শিকারী। অবসর সময়ে শিকারই ছিল তাদের প্রধান আকর্ষণ। মধ্যযুগের রাজারাও দক্ষ শিকারী ছিলেন। সেকালে ইউরোপে বন-জঙ্গল বেশী ছিল। এই জঙ্গলে নানা প্রকারের জীবজন্তু বাস করত। শিকারের কৌশল আয়ত্ত করা শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হোত। ধনীর গৃহে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন ঘটলে অতিথি আপ্যায়নের অঙ্গ হিসেবে নাচ-গানের ব্যবস্থা থাকত।

শিভ্যালরি বা নাইট-প্রথা ঃ সামন্ত প্রথার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল 'শিভ্যালরি' নামক বিশিষ্ট আচরণবিধি। যাঁরা এই বিধি ভালভাবে আয়ত্ত করতেন তারাই 'নাইট' উপাধি পেতেন। সামন্ত-সমাজে সবচেয়ে সম্মানিত ও খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়। নিজ নিজ অঞ্চলে তাঁরা ক্ষুদ্র রাজার মত বাস করতেন। প্রয়োজনের সময় রাজাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে হোত। সামন্তবংশীয় ছেলেরা বড় বড় বীর বা যোদ্ধাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠত এবং লেখাপড়া তেমন না শিখলেও ঘোড়ায় চড়া, শিকার-কৌশল ও অস্ত্রের ব্যবহার এবং দেহ ও মনের দিক দিয়ে খুবই সাহসী

হয়ে উঠত। সামন্ত যুগে শিক্ষানবিশ নাইটকে খেলাধূলায় দক্ষতা, পরিচ্ছন্নতা, নিরলস পরিশ্রম, এমন কি গান-বাজনা ও কবিতা রচনার ক্ষমতাও অর্জন করতে হত। সে যুগে নাইট হওয়া খুবই সম্মানের ব্যাপারে ছিল।

নাইট

শিক্ষা শেষ হলে সামন্ত বা কোন খ্যাতনামা নাইট নতুন শিক্ষার্থীর ঘাড়ে তরবারির উল্টো দিক দিয়ে মৃদু আঘাত করে তাকে নাইট বলে সম্বোধন করলেই সে স্বীকৃতি পেত। চার্চের নির্দেশে একে উৎসবের রূপ দেওয়া হয়। নিাদষ্ট দিনে স্নান করে শুদ্ধ হওয়ার পর ভাবী নাইট সাদা লিনেন ও লাল সূতীর কাপড় পরে চার্চের বেদীর কাছে নতজানু হয়ে তার দোষ-ত্রুটি স্বীকার করত। আগে পুরা একদিন সে উপবাসে থাকত। বিশপ তাকে অবিচলভাবে কর্তব্য পালনের উপদেশ দিয়ে শপথ করাতেন। বীরধর্মী কাজ ছাড়াও নাইটের আরও কতকগুলি আচরণ শিখতে হতো। এটাই ছিল শিভ্যালরির অঙ্গ। নাইটের কাছে আশা করা হতো যে, বিপন্নকে উদ্ধার করার জন্য নাইট নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করবে না। কোন কোন রাজ্যে নাইটদের যুদ্ধবিদ্যা ও বীরধর্ম শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক কাজেও দক্ষ করে তোলা হোত। মধ্যযুগের ইউরোপে নর্সমেন, ম্যাগিয়ার, শ্লাভ ও সারাসেন প্রভৃতি বর্বর জাতি ও উপজাতিদের প্রতিহত করতে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী অশ্বারোহী নাইটদের প্রয়োজন ছিল। এদের বীরত্ব ছাড়া মধ্যযুগে ইউরোপের অস্তিত্ব রক্ষা করা যেত কিনা সন্দেহ।

ট্রুবাদোর কবিদল ঃ মধ্যযুগের ইউরোপের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতির মত সাহিত্যেও সামন্ত-প্রথার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ফ্রান্স, উত্তর স্পেন এবং উত্তর ইতালিতে এক শ্রেণীর কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের বলা

হতো ট্রুবাদোর। ট্রুবাদোরগণ নিজেরাই কবিতা রচনা করতে পারতেন। গান রচনা করা এবং গান গাওয়া তাঁদের পেশা ছিল। তাঁদের লেখা কবিতা লোকের মুখে মুখে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ত এবং তাঁদের প্রেরণায় নাইটরাও বিখ্যাত হয়ে উঠতেন। মধ্যযুগে ট্রুবাদোর কবিগণ অসাধারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের বাক্-স্বাধীনতা ছিল এবং তাঁরা রাজনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গেও জড়িত থাকতেন। তাঁরা সামন্ত প্রভুদের দরবারের রমণীদের ঘিরে সভ্যতার এক আবহাওয়া গড়ে তুলেছিলেন। ট্রুবাদোরগণের সঙ্গে প্রায়ই জনৈক সহযোগী থাকতেন। তিনি 'জাগলার' নামে অভিহিত হতেন। ট্রুবাদোররা যে গান রচনা করতেন জাগলাররা তাতে স্থর দিতেন। মধ্যযুগের ইউরোপের প্রায় ছ' শতাব্দীর ইতিহাসে প্রায় চার শ' ট্রুবাদোর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ম্যানর পদ্ধতিঃ ম্যানর বলতে বোঝায় কোন সামন্ত-প্রভুর জমিদারীর শাসনকেন্দ্রকে। তাই ম্যানরকে সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার স্থানীয় সংগঠন বলা হয়। এই ম্যানর প্রথার মধ্যেই সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক রূপটি প্রতিফলিত হয়েছিল। বলপূর্বক অধিকৃত কিংবা রাজার কাছ থেকে সামন্ততান্ত্রিক নিয়মে লাভ করা জমিতে সামন্তগণ এক বিচিত্র পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। জমি চাষ করা হতো সমবায়ের ভিত্তিতে। যারা চাষ করত তারা সামন্তের অধীনে প্রজা বা ভূমিদাস বলে গণ্য হতো। এক বা একাধিক গ্রামকে স্থরক্ষিত করে ম্যানর বা খামার তৈরি হোত। এক একটি ম্যানরে নয় শ' থেকে ছ'হাজার একর পর্যন্ত জমি থাকত। জমিগুলিকে তিনভাগে ভাগ করে এককালীন ছ'ভাগে চাষ করা হোত আর এক ভাগ জমি ফেলে রাখা হোত। পরের বছর পতিত জমিতে চাষ করে আর এক ভাগকে পতিত করে ফেলে রাখা হতো। এতে জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হোত না এবং উৎপাদনও বাড়তো।

ম্যানরে ছিল সামন্ত মালিকের একচ্ছত্র শাসনের অধিকার। ম্যানরের মধ্যে সামন্ত মালিকের এই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার যেমন

ছিল প্রশাসনিক সুব্যবস্থা, তেমনি ছিল বিচারব্যবস্থা। চাষী-প্রজাদের উপর সামন্ত মালিকের রাজনৈতিক ও সম্পত্তিগত অধিকার কায়েম করবার জন্যই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। চাষী প্রজাদের কঠোর শ্রম এবং সামন্তমালিককে নানাভাবে দেয় বাধ্যতামূলক কর—এই দুইয়ের উপর সামন্ত-ব্যবস্থা ও সামন্ত-অভিজাততন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে উঠে।

সামন্ত-প্রথার উদ্ভবের ফলে কৃষকগণ আত্মরক্ষার জন্য সামন্ত প্রভুদের আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কালক্রমে সামন্তপ্রভুরা রোমান ক্রীতদাসদের মত তাদের প্রজাদের উপরেও সকল প্রকার অধিকার লাভ করেন। অবশ্য স্থানীয় রীতির দ্বারা সামন্ত ও তাঁর প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হোত। ম্যানর প্রথার মুল বৈশিষ্ট্যগুলি এক হলেও দেশভেদে ম্যানরের নানারকম রূপ দেখা যেত। সাধারণত যেসব গ্রামে কৃষিজীবীর সংখ্যা বেশী ছিল সেখানেই ম্যানর পদ্ধতিতে চাষ হোত। পর্বত-সংকুল অঞ্চলে, সমুদ্র তীরবর্তী জমিতে এবং বন কেটে বসত করা জমিতে ম্যানর গঠন করা হোত না। জমি কি কাজে লাগানো হবে অথবা কোন্ চাষ প্রয়োজন, ম্যানর ব্যবস্থার গঠন তার উপরেই নির্ভর করত। যেমন জলপাই বা আঙ্গুর চাষের জমিতে কখনও ম্যানর ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি।

ম্যানরে কর্মসূচী ঃ সমবায় ভিত্তিতে ম্যানরে চাষ করা হতো। কৃষিক্ষেত্র উন্মুক্তই থাকত। চাষীরা এক সঙ্গে জমিতে লাঙল দিত, বীজ বুনত ও ফসল কাটত। পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তাগিদেই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল। সে যুগে অনুন্নত কৃষিযন্ত্র এবং কৃশ বলদের দ্বারা একক ভাবে পাথুরে শক্ত জমি কর্ষণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই একাধিক চাষীর মিলিত প্রচেষ্টায় অনেকগুলি বলদের সাহায্যে জমি চাষ করা হোত। প্রকাণ্ড কৃষিক্ষেত্রের এক বা একাধিক খণ্ডের মালিক ছিল প্রত্যেক চাষী। আলের সাহায্যে জমির সীমানা নির্ধারণ করা থাকত। এক-এক খণ্ড জমির গড় আয়তন ছিল

এক বর্গ মাইল। কৃষি জমির এক-তৃতীয়াংশের মালিক ছিলেন সামন্ত মালিক স্বয়ং। প্রায় ক্ষেত্রেই চাষীদের জমির পাশে সামন্ত মালিকের জমি থাকত। চাষীরা নিজেদের জমি চাষ করবার সময় মালিকের

ম্যানর গ্রাম
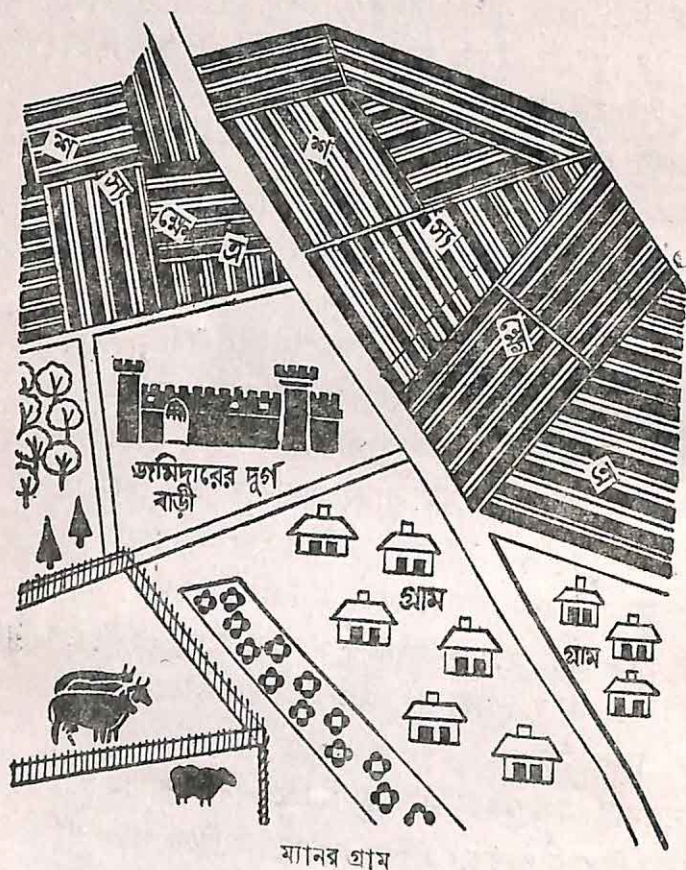
জমিও চাষ করে দিত। এর জন্য চাষী কোন পারিশ্রমিক পেত না। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চাষী সপ্তাহে তিন দিন দুটি বলদের সাহায্যে মালিকের জমি চাষ করত। ফসল কাটার সময়ও মালিকের জন্য চাষীদের অতিরিক্ত শ্রম করতে হত।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ বিচারালয়—ম্যানরগুলি ছিল সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আঞ্চলিক কেন্দ্র। সামন্তগণ রাজার কাছ থেকে যে শাসনক্ষমতা লাভ করতেন, তা তারা প্রয়োগ করতেন দুর্গ প্রাসাদে

অথবা ম্যানরে। যাঁদের দুর্গ ছিল না, ম্যানরই ছিল তাদের বাসস্থান। সামন্ত মালিকরা ম্যানরের কৃষিকার্য পরিচালনা ছাড়াও প্রজাদের অভাব-অভিযোগ, সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনে তার প্রতিকার করার জন্য সেখানেই তাঁরা এক ধরনের প্রশাসন গড়ে তুলতেন। এজন্য 'স্টুয়ার্ড,' 'বেলিফ্' প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োগ করা হতো। ম্যানরের কাজকর্ম পরিদর্শনের জন্য গ্রামবাসীরাই বিভিন্ন কর্মচারী নিয়োগ করতেন। 'সুপারভাইজার' ছিলেন প্রধান পরিদর্শক। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে শস্য রক্ষা করার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল 'হে-ওয়ার্ড' নামক কর্মচারীর উপর। সমস্ত প্রজাদের নিয়ে ম্যানরের হলঘরে, গ্রামের চার্চে অথবা খোলা জায়গায় বিচার-সভা বসত। সে যুগে কোন লিখিত আইন ছিল না। প্রচলিত প্রথা ও উপস্থিত জনগণের বিবেচনা অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা হতো। সামন্ত-প্রভু এবং গ্রামবাসীদের নামে বিচারকার্য হতো। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিনের প্রচলিত আইনবিধিগুলিকে সংকলন করে লিখিত আইনের রূপ দেওয়া হয়। এই আইন লঙ্ঘনের কারোর ক্ষমতা ছিল না। ইংলণ্ডের একটি ম্যানরে বল খেলার অপরাধে কয়েক ব্যক্তিকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। খারাপ পানীয় বিক্রির অপরাধে জনৈক বিক্রেতাকে অনুরূপ শাস্তি পেতে হয়েছিল। জরিমানা হিসেবে যে অর্থ আদায় হতো তা ছিল সামন্ত-প্রভুর প্রাপ্য।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ কৃষকপ্রজাদের দিয়ে চাষ-আবাদের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন করাই ছিল ম্যানরের প্রধান কাজ। জীবন-ধারণের উপযোগী আরও অনেক জিনিস ম্যানরে উৎপন্ন হতো। এক হিসেবে ম্যানর ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। ম্যানরে উৎপন্ন জিনিস দিয়ে কেবল গ্রামবাসীদের প্রয়োজন শুধু মিটত না, বাড়তি জিনিস বাজারে বিক্রী হতো। ম্যানরে বসবাসকারী স্ত্রীলোকেরা তাঁতে কাপড় বুনত, পশম রং করত। পুরুষেরা চামড়া দিয়ে জুতো, ঘোড়ার লাগাম ইত্যাদি তৈরি করত। ম্যানরের ভিতরেই থাকত গম কল, রুটি তৈরির কারখানা ও পানীয় উৎপাদন ব্যবস্থা। এইসব কারখানার মালিক ছিলেন সামন্ত-

প্রভু। প্রত্যেক ম্যানরবাসীকে ঐ কারখানায় তৈরি জিনিস অবশ্যই ব্যবহার করতে হতো, নতুবা শাস্তি দেওয়া হতো। কেবলমাত্র বিলাসের সামগ্রী এবং কিছু কিছু মশলা ম্যানরে উৎপন্ন হতো না বলে সেগুলি বাইরে থেকে আমদানি করা হতো।

ম্যানর-পদ্ধতিতে চাষীদের অবস্থা ঃ ম্যানরবাসী কৃষকপ্রজাদের জীবন মোটেই সুখের ছিল না। তাদের প্রকৃত অবস্থা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল—(ক) তাদের ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং (খ) তাদের ভূমির অধিকার। ভূমিদাসরা উত্তরাধিকারসূত্রে জমির বন্দোবস্ত পেত এবং কোন ভূমিদাসের সন্তান ভূমিদাস রূপেই জন্মগ্রহণ করত। কোন ভূমিদাস স্বাধীন পরিবারের কোন নারীকে বিবাহ করলেও তাদের সন্তানদের ভূমিদাস হওয়া থেকে অব্যাহতি ছিল না। তবে স্বাধীন পরিবারে বিবাহ করার জন্য ভূমিদাস পুরুষদের সামাজিক মান কিছুটা উন্নত হতো।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভূমিদাসগণ কোন অংশেই ক্রীতদাসদের অপেক্ষা উন্নত ছিল না। আইনতঃ সে ছিল প্রভুর সম্পত্তি এবং পশুর চেয়েও তার অবস্থা উন্নত ছিল না। সে কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারত না। তাকে ক্রীতদাসদের ন্যায় বিক্রয় করা যেত এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তার মূল্য উৎকৃষ্ট একটি ঘোড়ার মূল্যের চেয়ে বেশী হতো না। আইন তাকে ব্যক্তিরূপে কোন স্বীকৃতি দেয় নি। একজন ভূমিদাস অপর একজন ভূমিদাসের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারত। কিন্তু একজন ভূমিদাস স্বাধীন নাগরিকদের বিরুদ্ধে বা তার মালিকের বিরুদ্ধে কোন মামলা করতে পারত না। কোন ভূমিদাস তার ইচ্ছামত কোন কাজ করতে বা তার ইচ্ছানুসারে এক ম্যানর থেকে অন্য ম্যানরে যেতে পারত না। বহু শতাব্দীর রীতিনীতি ভূমিদাসদের স্বাধীনতা অভাবনীয়রূপে সীমাবদ্ধ বা সংকুচিত করেছিল। অপরপক্ষে এও স্থিরীকৃত হয়েছিল যে, ভূমিদাসরা কোনক্রমেই জমি ত্যাগ করতে সক্ষম হবে না এবং জমি হতে ভূমিদাসদের উৎখাত করা যেত না।

ম্যানরে কর ধার্যের নীতি ঃ প্রথানুযায়ী প্রজাদের উপর ইচ্ছামত কর বসানোর আইন-সংগত অধিকার সামন্তদের ছিল। স্থানীয় রীতি-নীতি অনুসারেই করের পরিমাণ নির্ধারিত হত এবং টাকা অথবা ফসল দিয়ে তা পরিশোধ করা যেত। প্রভুর প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ প্রত্যেক প্রজাকে প্রতি বছর 'ক্যাপিটেশন'-কর দিতে হতো। এছাড়া ছিল 'টেইলি' নামক সম্পত্তি-কর। 'হেরিয়ট' নামক উত্তরাধিকার-করও ভূমিদাসদের পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি প্রাপ্তির সময় দিতে হতো। প্রধান প্রধান উৎসবের সময়ও (যেমন—'খৃষ্টমাস' এবং 'ইস্টার') ভূমিদাসদের কিছু কিছু অর্থ রীতি অনুসারে দিতে হতো। ম্যানরের খাজনা ছাড়াও ভূমিদাসদের 'তাইত' নামক ধর্মীয়-করও দিতে হতো। এছাড়াও সামন্ত-মালিকের শস্য চূর্ণ করবার যন্ত্র, রুটি স্যাঁকবার যন্ত্র, মদ্য প্রস্তুত করবার যন্ত্র, গ্রাম্য কূপ প্রভৃতি ব্যবহার করবার জন্যও প্রজাদের 'ব্যানালিটিজ' নামক কর দিতে হতো। সেতু ও রাস্তা ব্যবহার করবার জন্য সামন্ত-প্রভুরা কৃষকদের নিকট হতে কর আদায় করত। সামন্ত-প্রভুর মত চার্চকেও কৃষক অথবা প্রজাদের নানা রকম কর দিতে হতো। 'টিথস' নামক ধর্ম-কর এবং 'মরচুয়ারি' নামক সংকার-কর এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কোন করের আর্থিক মূল্য খুব বেশী না হলেও, এদের সামগ্রিক পরিমাণ প্রজাদের কাছে গুরুভার বোঝার মতই মনে হতো।

ম্যানরে বিবাহ-রীতি ঃ বিবাহের আগেই ভূমিদাসকে সামন্ত-প্রভুর কাছে অনুমতি নিতে হতো। এর জন্য নির্দিষ্ট একটা ফি ধার্য ছিল। একই ম্যানরের লোকজনদের মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক ঘটলে তেমন অসুবিধা হতো না। কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্কে একাধিক ম্যানরের প্রজারা জড়িয়ে পড়লে যথেষ্ট গণ্ডোগোলের সৃষ্টি হতো। অবশ্য চার্চের হস্তক্ষেপে এই অবস্থার প্রতিকার করা হতো। সেই সময় স্থির হয়, সামন্ত-প্রভুদের অনুমতি নিয়ে দুই ম্যানরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিবাহ হবে। আরও স্থির হয়, যে-ম্যানরের মেয়ে স্বামীর ঘরে যাবে তার স্বামীর ম্যানর থেকে একটি কুমারী মেয়েকে তাদের ম্যানরে পাঠাতে হবে।

এটা সম্ভব না হলে সামন্ত-প্রভুকে পরিমিত অর্থ দিয়ে স্বামীর কাছে যাবার অনুমতি নিতে হবে। এ ছিল এক ধরনের কন্যা পণ, তবে পণের টাকা পেত সামন্তমালিক। বহুক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বিবাহ-রীতি প্রচলিত ছিল। সামন্ত-প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে ভূমিদাসরা বিবাহে বাধ্য থাকত। অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী মনোনয়নে সামন্তমালিকের মত-ই ছিল চূড়ান্ত।

দুর্গে ম্যানরবাসীদের জীবনযাত্রা : মধ্যযুগের জমিদারদের কারো কারো বিশাল দুর্গপ্রাসাদ ছিল, আবার কারো কারো ছিল ছোট 'ম্যানর হাউস'। প্রস্তরনির্মিত এই প্রাসাদসমূহে প্রভাবশালী সামন্ত ও নাইটগণ বাস করতেন। যে-সকল অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা ছিল না, শান্তি বিরাজ করত, সেই অঞ্চলসমূহের ম্যানর হাউসগুলি ছিল কাঠের তৈরি। অনেক জায়গা নিয়ে ছিল ম্যানর হাউসের অবস্থান। এই ম্যানর হাউসের চারদিক ছিল প্রাচীরবেষ্টিত। প্রবেশপথে ছিল লোহার পাতযুক্ত বিশাল কপাট। প্রাচীরের বাইরে প্রশস্ত পরিখা সর্বদাই জলে পূর্ণ থাকত। পরিখার উপর একটি চেন লাগানো সেতু থাকত। শত্রু আসছে এই খবর পেলেই চেন টেনে সেতুটি উপরে তুলে ফেলা হতো। ফটকের গায়ে ছোট জানালা দিয়ে প্রহরী বাইরের দিকে নজর রাখত। প্রাচীরের মধ্যে ছিল বিশাল প্রান্তর, খামার-বাড়ি ও আস্তাবল। মাটির নীচে ছিল কারাগার এবং তার উপরে ভাড়ার ঘর। বাড়ির মধ্যে চ্যাপেল বা উপাসনা ঘর, একটি প্রকাণ্ড হলঘর আর কয়েকখানি শয়নঘর থাকত। ঘরের দেওয়াল ছিল অত্যন্ত পুরু। মেঝেতে কাঠের তক্তা। আসবাবপত্র খুব একটা বেশী ছিল না। সামন্তশ্রেণী ও নাইটগণ দলবদ্ধভাবে ঘোড়ায় চড়ে শিকারে যাত্রা করতেন। তাঁদের সঙ্গে থাকত কুকুর এবং শিকলে বাঁধা বাজপাখী। এছাড়া ম্যানর হাউসে নাচ, গান ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। ম্যানর হাউসটি ছিল একটি বিশাল উচ্চগৃহ। এই গৃহটি অধিকাংশ সময়ে অন্ধকার থাকত। অনেক সময় বাতি বা মশাল জ্বালিয়ে রাখা হতো। সে আলোয় সামন্তগণ দরবারে বসতেন।

ম্যানরবাড়ির কাছেই থাকত গ্রাম্য চার্চ। প্রত্যেক ম্যানরে একজন পুরোহিত থাকতেন। তিনি ম্যানরবাসীদের বুঝাতেন যে, ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন এবং যারা রবিবার গীর্জায় যায় না এবং মিথ্যা কথা বলে তারা মহাপাপী, মৃত্যুর পর তারা নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে। পুরোহিত তাদের আরও বুঝাতেন যে, রোমের পোপই ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং তাঁর কথা অমান্য করা মহাপাপ। পোপের নাম করে পুরোহিত তাদের নিকট হতে অর্থের এক-দশমাংশ 'তাইত' বা ধর্মীয়-কর রূপে আদায় করতেন।

সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ঃ সামাজিক দিক থেকে ম্যানরবাসীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—অভিজাত, যাজক ও প্রজা। সামন্ত-প্রভু ও তাঁর পরিবারের লোকজন ছিলেন অভিজাত শ্রেণীভুক্ত। ম্যানরের মালিক হিসাবে সামন্তপ্রভু শুধু আর্থিক স্বচ্ছলতাই ভোগ করতেন না, তিনি ছিলেন প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ও বিশেষ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। ম্যানরের সঙ্গে যে চার্চ থাকত তার যাজকগণও নানারকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। কৃষক ও শ্রমিক প্রজারা সংখ্যায় অনেক বেশী হলেও সমাজে তাদের স্থান ছিল সবচেয়ে নীচে।

চাষীপ্রজার দুঃসহ জীবনযাত্রা ঃ চাষীপ্রজাদের গ্রামে সাধারণতঃ বার থেকে ষাটটি পরিবার বাস করত। খড়ে-ছাওড়া জানালাহীন মাটির কুঁড়েঘরই ছিল তাদের বাসস্থান। মাটির মেঝেতে খড় বা শুকতো পাতা বিছিয়ে শোবার ব্যবস্থা হতো। কোন চাষীর হাঁস-মুরগী ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু থাকলে তাদেরও আশ্রয় দিতে হতো ঘরের মধ্যে। এককথায় অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের থাকতে হোত। চাষীর বাড়িতে বাসনপত্র থাকত সামান্যই। গ্রীষ্মকালে রান্নার কাজ চলতে ঘরের বাইরে। কিন্তু ইউরোপে শীতঋতুর প্রাধান্য থাকায় বছরের বেশির ভাগ সময় রান্নার কাজ করতে হতো ঘরের মধ্যে। ফলে জানালাবিহীন ঘরের মধ্যে আগুনের ধোঁয়ায় তাদের কষ্ট হতো ভীষণ। বাড়ির সব্‌জি বাগান হতে তাদের জন্য সব্‌জি আসত। চাষীদের খাদ্য-তালিকায় মাংসের ব্যবস্থা ছিল বিলাসিতার

সামিল। তাদের জন্য মোটা রুটি তৈরি হতো গম ও রাই মিশিয়ে। মোটা রুটি অনেক সময় পেটে থাকবে এবং কঠোর পরিশ্রম ছাড়া তা হজম হবে না, এটাই ছিল তাদের প্রচলিত ধারণা। কোন দিন দুধ, মাখন ইত্যাদি পেলে চাষীদের আনন্দের সীমা থাকত না।

ম্যানর-জীবন থেকে অব্যাহতি লাভের উপায়ঃ দুঃসহ ম্যানর জীবন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য প্রজারা নানাভাবে চেষ্টা করত। প্রভুকে খুশী করতে পারলে তিনি স্বেচ্ছায় তাদের মুক্ত দিতেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে চার্চ, মঠ বা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেও কেউ কেউ স্বাধীন হয়ে যেত। অবৈধ হলেও অনেক প্রজা শহরে পালিয়ে গিয়ে ব্যবসায় কিংবা কারিগরীশিল্পে যোগ দিত। শহরের বিশেষ নিয়মানুযায়ী অধিবাসীরা সকলেই স্বাধীন নাগরিক বলে গণ্য হতো। ম্যানরবাসীদের ক্রীতদাসত্ব মোচনের আর একটি প্রচলিত উপায় ছিল—বিদ্রোহ। শোষণ ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হত ও প্রভুর কাছ থেকে মুক্তি আদায় করত।

॥ অনুশীলনী ॥

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। সামন্ততন্ত্রে রাজারা স্থায়ী সৈন্যদল রাখতেন না কেন ?
২। মধ্যযুগে দুর্গগুলি উঁচু জায়গায় তৈরি হতো কেন ?
৩। নাইট নিয়োগ করা হতো কি ভাবে ?
৪। নাইটদের কি কি গুণ অর্জন করতে হতো ?
৫। ক্যাপিটেশন, টেইলি ও টিথস কাকে বলে ?
৬। ম্যনরের কৃষক-প্রজারা পালিয়ে যেত কেন ?
৭। 'অধিকার রক্ষার যুদ্ধ' কাকে বলে ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। 'সামন্তপ্রথা' কি ? কি ভাবে এই প্রথার উৎপত্তি হয়েছিল ?
২। মধ্যযুগের দুর্যোগপূর্ণ দিনে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় সামন্তপ্রথার অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩। মধ্যযুগে সামন্তদুর্গ তৈরির পরিকল্পনা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৪। সামন্তযুগে অশ্বারোহী সৈনিক কিভাবে বর্মাচ্ছাদিত হতো ?

৫। সামন্তযুগে ইউরোপের জীবনযাত্রা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। 'শিভালরি' বলতে কি বোঝ?

৭। 'ম্যানর' প্রথা কি? এই প্রথার কি ভাবে উৎপত্তি হয়েছিল?

৮। ম্যানরের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

৯। ম্যানরবাসী কৃষকদের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল? এই জীবন থেকে কৃষকেরা কি ভাবে অব্যাহতি পেত?

১০। ম্যানর পদ্ধতিতে চাষীদের অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১১। ম্যানরে বিবাহ-রীতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১২। দুর্গে ম্যানরবাসীদের জীবনযাত্রা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) সামন্তযুগের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল—নামক বিশিষ্ট আচরণ-বিধি।

(খ) মধ্যযুগে একশ্রেণীর কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের বলা হতো —।

(গ) — বলতে বোঝায় কোন সামন্তপ্রভুর জমিদারীর শাসনকেন্দ্রকে।

(ঘ) সামন্তগণ — কাজ থেকে শাসনক্ষমতা লাভ করতেন।

(ঙ) পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে শস্য রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল — নামক কর্মচারীর উপর।

সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ

(ক) 'ক্রস-বো, (খ) নাইট, (গ) সুপারভাইজার।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। সামন্ত-প্রথা ইউরোপে কতদিন চালু ছিল?

২। ম্যানর কাকে বলা হতো?

৩। নাইট উপাধি কাদের দেওয়া হতো?

৪। ট্রুবাদোর কবিদল কি কাজ করত?

৫। ভূমিদাস কাদের বলা হতো?

৬। ক্যাপিটেশন কি?

একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপের দেশগুলিতে এক অভাবনীয় ধর্মীয় উন্মাদনা দেখা দেয়। রাজা, সামন্ত সর্দার, নাইট এবং দলে দলে স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক পশ্চিম এশিয়ার ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের হাত থেকে যীশুখৃষ্টের পবিত্র সমাধিস্থান জেরুজালেমকে উদ্ধার করার জন্য যে অভিযান পরিচালনা করেছিল তাকে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ বলে। মাঝে মাঝে কিছুদিন বন্ধ থাকলেও প্রায় দু'শ বছর ধরে ক্রুসেড চলেছিল। মোট আটটি ক্রুসেড ঐতিহাসিকদের মতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তার মধ্যে আবার প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেড ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাইজানটাইন সম্রাট আলেক্সিয়াসের অনুরোধে পোপ দ্বিতীয় আরবান ক্রুসেডের সূচনা করেন।

প্রথম ক্রুসেড ঃ প্রথম ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের কথা প্রথম ঘোষণা করেন ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় আরবান। তুর্কীদের অকথ্য অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে পোপ খৃষ্টানদের উত্তেজিত করেন। তুর্কীদের অধিকৃত প্রাচ্য দেশগুলির সমৃদ্ধির কথাও তিনি উল্লেখ করে সেগুলি জয় করতে খৃষ্টানদের উদ্বুদ্ধ করেন। আরবানের আহ্বানে সকলের আগে সাড়া দেয় পশ্চিম ইউরোপের দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়। তারা এই ধর্মযুদ্ধকে তাদের বঞ্চিত ও নিপীড়ত জীবন থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তারা আশা করেছিল ধর্মযোদ্ধারূপে নতুন দেশে পৌঁছাতে পারলে সেখানে মুক্ত কৃষকের মতো বসবাস করতে পারবে। প্রথম ক্রুসেডে কোন রাজা যোগ না দিলেও লোরেনের ডিউক গডফ্রে, নর্মাণ্ডির ডিউক রবার্ট প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বীরগণ অংশ গ্রহণ করায় ধর্মযোদ্ধাদের মনোবল বেড়ে গিয়েছিল। এঁদের নেতৃত্বে কৃষক, শ্রমিক এবং সর্বশ্রেণীর মানুষ নিয়ে গঠিত বিশাল বাহিনী তাদের স্ত্রী-পুত্র পরিবারসহ ধর্মযোদ্ধা হিসেবে এগিয়ে গিয়েছিল পবিত্রভূমি জেরুজালেমকে উদ্ধার করবার জন্য। এই অভিযাত্রীদের হাতে তেমন কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, এমন কি খাদ্য ও রসদ সরবরাহের কোন বিশেষ

ব্যবস্থাও ছিল না। অভিযানকারীদের উৎসাহ ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সামর্থ্য তত ছিল না। এদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ছিল প্রচুর। তাই দীর্ঘ পথ চলার সময় তারা কখনও ভিক্ষা করেছে, কখনও চুরি-ডাকাতি করেছে, কখনও বা রাহাজানি করে জীবন বাঁচিয়েছে। অবশেষে এই অসংগঠিত কৃষক অভিযাত্রীদল বহু প্রাণের বিনিময়ে কনস্টান্টি-নোপলে পেঁছায়। এখানে অবস্থানকালে তারা বাইজানটাইন সম্রাট আলেক্সিয়াসকে তাঁর রাজ্যাংশ মুসলমানদের হাত হ'তে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেবার শপথ গ্রহণ করে। সম্রাটের গ্রীক সৈন্যরা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নিকিয়া ক্রুসেড বাহিনীর অধিকারে আসে। ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অভিযাত্রী বাহিনী জেরুজালেমে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তুর্কী বাহিনীর পরাজয় ঘটে। অতঃপর অধিকৃত অঞ্চলগুলি নিয়ে ত্রিপলি, এডেসা, অ্যান্টিয়োক এবং জেরুজালেম নামে চারিটি খৃষ্টান রাজ্য গড়ে উঠে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে স্বার্থ নিয়ে বিবাদের সুযোগে মুসলমানগণ একে একে সেগুলি অধিকার করে নেয়।

তুর্কী সুলতান কর্তৃক জেরুজালেম অধিকারঃ মুসলিম সুলতানরা পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে ধর্মযোদ্ধাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চলছিল অব্যাহত গতিতে। এই সময় তুর্কী সুলতান সালাদিনের সুযোগ্য নেতৃত্বে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ-ভাবে ধর্মযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে এবং ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাদের হাত থেকে জেরুজালেম ছিনিয়ে নেয়। এরপর জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের জন্য পরিচালিত হয় পশ্চিম ইউরোপের খৃষ্টভক্ত সামন্ত-প্রভুদের তৃতীয় **ক্রুসেড অভিযান**।

তৃতীয় ক্রুসেডঃ জেরুজালেম রাজ্যের পতনের ফলে নতুন করে অভিযান পাঠাবার প্রয়োজন দেখা দেয়। জার্মানরাজ ফ্রেডারিক বারবারোসা তার সুশৃঙ্খল জার্মানবাহিনী নিয়ে তৃতীয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু করেন। কিন্তু ফ্রেডারিকের আকস্মিক মৃত্যুতে এই বাহিনীর অনেকেই দেশে ফিরে যায়। অবশিষ্ট সেনাবাহিনী ইংরেজ

ও ফরাসী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। পর পর ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম রিচার্ড লায়নহার্টেড এবং ফিলিপ অগাস্টাসের নেতৃত্বে তৃতীয় ক্রুসেড পরিচালিত হয়। এই পবিত্র কাজে সকলে অভিযান করলেও এইসব রাজাদের মধ্যে একতা ছিল না। প্রথম থেকেই তারা পরস্পর কলহে মত্ত হন। ফলে এরা কয়েকটি স্থান অধিকার করতে সক্ষম হলেও জেরুজালেম উদ্ধার করতে পারেন নি। ফিলিপ অগাস্টাস দেশে ফিরে যাওয়ার পর রিচার্ড বাধ্য হয়ে তুর্কী সুলতান সালাদিনের সঙ্গে ১০৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিন বছরের জন্য এক যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। তৃতীয় ক্রুসেড তাই জেরুজালেম উদ্ধারের ব্যর্থ প্রচেষ্টার নামান্তর ছাড়া কিছুই নয়।

চতুর্থ ক্রুসেড : তৃতীয় ক্রুসেড খৃষ্টানদের পক্ষে লাভজনক না হওয়ায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট আবার এক ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানান। এই অভিযানে যোগদানকারী নাইট ও ডিউকদের মধ্যে স্বার্থপরতা এত বেশী ছিল যে, মুসলমানদের পরিবর্তে তারা পরস্পরের ক্ষতিসাধনেই বেশী আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ইতালির সমৃদ্ধ শহর ভেনিস প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাদের খাদ্য ও পারাপারের জন্য জাহাজ দিতে রাজী হল। ক্রুসেডদল ভেনিসের পাওনা মেটাতে খৃষ্টানশাসিত জারা শহরটি ধ্বংস করে তার হাতে তুলে দেয়। এর পর বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের গৃহবিবাদের সঙ্গে তাঁরা জড়িয়ে পড়ে। পরপর দু'বার কনস্টান্টিনোপল খৃষ্টান সৈন্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। ইউরোপীয় দেশগুলিতে ধর্মীয় উন্মাদনা যে কমে আসছিল চতুর্থ ক্রুসেডে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ক্রুসেডের উদ্দেশ্য ধর্মের প্রেরণা : বিভিন্ন রকমের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষ ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে যোগদান করেছিল। যেমন, যীশুখৃষ্টের জন্মভূমি জেরুজালেম খৃষ্টানদের অতি পবিত্র তীর্থস্থান। চতুর্থ শতাব্দী থেকে দলে দলে ইউরোপীয় খৃষ্টান সৈন্যসঞ্চয়ের আশায় তাদের পবিত্র তীর্থ জেরুজালেমে যেত। ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সেলজুক তুর্কীরা জেরুজালেম অধিকার করার পর, তীর্থযাত্রী খৃষ্টানদের উপর

নানাভাবে অত্যাচার করত। এমনকি খৃষ্টান গীর্জাগুলিকে পর্যন্ত তারা অপবিত্র করতে ছাড়েনি। তীর্থযাত্রীদের মুখে এই খবর ক্রমে ক্রমে প্রচারিত হওয়ায় সমগ্র খৃষ্টান জগৎ তুর্কী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৎপরে হয়ে উঠে।

পোপের নৈতিক প্রসার ঃ ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের ফলে চার্চগুলি দুর্নীতিমুক্ত হয়েছিল এবং তাদের ক্ষমতাও বেড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে পোপদেরও ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং তাঁরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেন। খৃষ্টধর্মের প্রতি অবমাননা এবং খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর অত্যাচারের খবর পেয়ে রোমের পোপ দ্বিতীয় আরবান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং সশস্ত্র অভিযানের সংকল্প গ্রহণ করেন।

পোপের অর্থলোভ ও মর্যাদা বৃদ্ধির বাসনা ঃ আধুনিক-কালের ঐতিহাসিকরা মনে করেন ক্রুসেড অভিযানের পেছনে পোপদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছাই ছিল প্রবল। চার্চের মর্যাদা ও ক্ষমতা বাড়ানোই ছিল তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তুর্কীদের হাত থেকে খৃষ্টধর্ম রক্ষা ছিল গৌণ উদ্দেশ্য। ক্রুসেড অভিযানকালে সমবেত ধর্মযোদ্ধাদের উপর কর্তৃত্ব এবং অর্থ-তহবিল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পাওয়ার লোভ যে পোপদের মধ্যে ছিল না, একথা একেবারেই অস্বীকার করা যায় না।

বাইজানটাইন সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশা ঃ বাইজানটাইন সম্রাট আলেক্সিয়াস ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির আশায় ক্রুসেডে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে তিনি তুর্কীদের কবল থেকে হৃত রাজ্যাংশ উদ্ধার করবেন। এই ধর্মযুদ্ধের সময় তিনি ইউরোপের মিলিত শক্তিকে তাঁর সাম্রাজ্য উদ্ধারের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

ধর্মযুদ্ধের প্রতি ইতালির মনোভাব ঃ রোম সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনগুলিতে ভেনিস, জেনোয়া, পীসা বন্দরগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য খ্যাতি ও সমৃদ্ধিলাভ করেছিল। নবম ও দশম শতাব্দীতে তুর্কী মুসলমানগণ সিসিলি, সার্ডিনিয়া ও বালিয়ারিক

দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে ভূমধ্যসাগরের পথে ইউরোপীয় বাণিজ্য ধ্বংস করে ফেলে। তখন বন্দর কর্তৃপক্ষ বাইজানটাইন সম্রাট নর্মান সেনাপতিদের সাহায্যে জলপথের নিরাপত্তা রক্ষায় সচেষ্ট হন। জলপথে ক্রুসেড অভিযানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে রাজা ও সামন্তদের কাছ থেকে বন্দরগুলি সাহায্যের বিনিময়ে শুধু অর্থ নয়, স্বায়ত্ত-শাসনও আদায় করে।

সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে ক্রুসেডের প্রভাব ঃ প্রায় দু'শ বছর ধরে ক্রুসেড অভিযানের ফলে সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা প্রভাব অনুভব করা যায়। পশ্চিম ইউরোপের অনুন্নত ল্যাটিন সভ্যতা উন্নততর বাইজানটাইন সভ্যতার উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু প্রাচ্যদেশের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি পশ্চিম ইউরোপকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল, যেমন—

(১) সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে সমাজের ভিত্তি ছিল কৃষি। ম্যানর পদ্ধতিতে পরিচালিত কৃষিকাজে অসংখ্য মানুষ নানাভাবে দায়বদ্ধ হয়ে পড়েছিল। (২) ক্রুসেডের ডাকে যে-সব সামন্ত সাড়া দিয়েছিলেন তাঁদের প্রজারা এই সুযোগে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। (৩) সামন্ত সর্দারগণ দীর্ঘকাল বিদেশে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে জমিদারী দেখাশোনা করতেন তাঁদের পত্নী বা অন্য স্ত্রীলোকেরা। এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে কৃতিত্ব দেখাবার ফলে স্ত্রীলোকদের মর্যাদার অভাবনীয় উন্নতি হয়।

ক্রুসেডে অভিযানকারীরা দীর্ঘকাল প্রাচ্যদেশে বসবাস করে। এর ফলে ইউরোপীয় সমাজজীবনে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে। পোশাক পরিচ্ছদেও নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। ইউরোপীয়রা প্রাচ্য-দেশ থেকে ধান, লেবু, খোবানি, তরমুজ ও আখের চাষ-আবাদ শিখে নিজেদের দেশে তার প্রবর্তন করে। তারা চিনি, মশলা, সুগন্ধিদ্রব্য, আয়না, পাউডার, কারুকার্যখচিত মাটির পাত্র প্রভৃতি ব্যবহার করার শিক্ষাও গ্রহণ করে প্রাচ্যদেশ থেকে। এছাড়া রেশম উৎপাদন, কাচ

ও ধাতু দ্রব্য তৈরির উন্নত কলাকৌশলও তারা আয়ত্ত করে। আহার্য গ্রহণের আগে হাত ধুয়ে নেবার রীতি তারা গ্রহণ করে প্রাচ্যদেশ থেকে। গরম জলে স্নান করার অভ্যাসটিও তারা প্রাচ্যদেশ থেকে শিখে ইউরোপে চালু করে।

প্রাচ্যদেশের স্থাপত্য-কলা, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। জেরুজালেমের গীর্জা-স্থাপত্যের অনুকরণে ইউরোপে অনেক গীর্জা প্রস্তুত হয়। প্রাচ্যদেশে যে-সব গল্প-কাহিনী প্রচলিত ছিল সেগুলিকে ভিত্তি করে ইউরোপের সাহিত্যিকরা এক ধরনের রোমান্টিক কাহিনীর সৃষ্টি করেন। গ্রীকভাষা থেকে অ্যারিস্টটলের রচনার অনুবাদ শুরু হয়। অনেক ভ্রমণ-বৃত্তান্তও রচিত হতে থাকে। এর মধ্যে মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য। মুসলিমদের উন্নততর ভেষজ-বিজ্ঞান থেকে ইউরোপ অনেক কিছুই গ্রহণ করে, এমন কি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মুসলিম চিকিৎসককেও তারা ইউরোপে নিয়ে আসে। ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রসার ঘটে। এই-ভাবে ক্রুসেড অভিযানের মাধ্যমে ইউরোপের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে নানা পরিবর্তন সূচিত হয়।

নতুন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র : ধর্মযুদ্ধসমূহের ফলেই পশ্চিম ইউরোপে বহু নতুন নতুন শহর এবং বাণিজ্যকেন্দ্রের উদ্ভব হয়েছিল। ক্রুসেডে যোগদানকারী সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য ও অন্যান্য যে-সব জিনিসের প্রয়োজন ছিল, প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থায় শহরগুলি তা পুরাপুরি সরবরাহ করতে পারত না। স্থল ও জলপথে নিরাপত্তা আসার ফলে অনেক নতুন দেশের বাজারেও তাদের পণ্যসামগ্রী পাঠাতে হতো। এই পরিস্থিতিতে নতুন শহর গড়ে তুলে উৎপাদন বাড়াতে হয়েছিল। পুরানো বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ পড়তে থাকায় নতুন বাণিজ্য-শহরের পত্তন করা হয়। ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী ইতালিতেই বেশী বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠে। এই বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির মধ্যে ভেনিস, জেনোয়া, অ্যামলকি, নেপল্‌স, পালেরমো মিলার, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইতালির ব্যবসা-বাণিজ্য

এইভাবে স্বদেশ ও বিদেশে বিস্তারের মূলে ক্রুসেড অভিযানের গুরুত্ব অপরিসীম।

কৃষি ও শিল্পের স্বতন্ত্র বিকাশ ঃ একাদশ শতক থেকেই ইউরোপে কারুশিল্প তথা কুটিরশিল্পের বিকাশ শুরু হয়। প্রথমদিকে কারুশিল্পীরা দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে কারুশিল্পের উৎপাদনে মনোযোগ দিত। কৃষিকাজের অবসরে তারা এই কাজগুলি করত। পরে তারা সংঘবদ্ধভাবে এক-একটি বসতি স্থাপন করে নানাবিধ শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করতে থাকে। দ্বাদশ শতকের মধ্যে ক্রুসেড অভিযানের ফলে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রাচ্যদেশে প্রসারিত হয়। ফলে শিল্পদ্রব্যের চাহিদাও বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। তখন একই ব্যক্তির পক্ষে কৃষিকাজ ও কারুশিল্পের কাজে আত্মনিয়োগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন ইউরোপের মানুষ আর্থিক লাভের আশায় শিল্পকেই জীবিকার একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করে। এর ফলে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপের কুটিরশিল্প ও কৃষি দুই ভিন্ন-পথে বিকাশ লাভ করতে থাকে।

॥ অনুশীলনী ॥

সংক্ষিপ্ত উত্তরীভিত্তক প্রশ্ন ঃ

১। 'ক্রুসেড' বলতে কি বোঝ? ক্রুসেড কতদিন ধরে চলেছিল? কোন কোন ক্রুসেড বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য?

২। প্রথম ক্রুসেডের আহবান কে জানিয়েছিলেন?

৩। তৃতীয় ক্রুসেডের উদ্যোক্তা কারা ছিলেন? তৃতীয় ক্রুসেড সফল না হওয়ার প্রধান কারণ কি ছিল?

৪। চতুর্থ ক্রুসেডের উদ্যোক্তা কে ছিলেন। এই ক্রুসেড কি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল?

৫। কৃষিকাজ থেকে কারুশিল্প বিচ্ছিন্ন হওয়ার মূল কারণ কি?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ক্রুসেড কাকে বলে? প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। প্রথম ক্রুসেড অভিযানে কেন কৃষকেরা যোগদান করে ? এই অভিযান সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। কোন সুলতানের নেতৃত্বে সেলজুক তুর্কীরা জেরুজালেম দখল করে ? জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য পরবর্তী ক্রুসেড অভিযানের কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। ক্রুসেডের পিছনে কি কি উদ্দেশ্য ছিল ?

৫। ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ক্রুসেডের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। ক্রুসেডের অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৭। ক্রুসেডের প্রভাবে ইউরোপে নতুন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৮। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের শিল্প ও কৃষির মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ কিভাবে ঘটল ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া কথাগুলি থেকে শুদ্ধটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও ঃ

(ক) ক্রুসেডের সূচনা হয় পোপ — এর আমলে (প্রথম শ্রেণীর / তৃতীয় লিও / দ্বিতীয় আরবান)

(খ) বাইজানটাইন সম্রাট — এর অনুরোধে পোপ দ্বিতীয় আরবান ক্রুসেডের সূচনা করেন (কনস্টানটাইন / শার্লম্যান / আলেক্সিয়াস)

(গ) ক্রুসেডে গিয়ে প্রাণ হারায় রাজা — (শার্লম্যান / প্রথম রিচার্ড / ফ্রেডারিক বারবারোসা)

(ঘ) পশ্চিম ইউরোপের ভুমিদাসরা ক্রুসেডের ফলে — হয় (ধ্বংস / স্বাধীন / পরাধীন)।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। যীশুখৃষ্টের পবিত্র সমাধিভুমি কোথায় ?

২। খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর কারা অত্যাচার করত ?

৩। কে প্রথম প্রকাশ্যে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানান ?

৪। কত খৃষ্টাব্দে প্রথম ক্রুসেড শুরু হয় ?

৫। দ্বিতীয় আরবান কে ছিলেন ?

৬। তৃতীয় ইনোসেন্ট কে ছিলেন ?

৭। চতুর্থ ক্রুসেডের জন্য কে আহ্বান জানান ?

———

শহরের বিকাশে ধর্মযুদ্ধ ও গিল্ডের প্রভাবঃ ঐতিহাসিক কাগজপত্রের অভাবে শহরের বিকাশ কিরূপে হয়েছিল তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। মধ্যযুগের শহরগুলি কি রোমান শহরসমূহ হতে, না ম্যানর হতে, না মঠ হতে অথবা দুর্গ হতে উৎপত্তি হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট কোনও ধারণা নেই। শহরসমূহ কি জার্মান সঙ্ঘ গিল্ডসমূহ অথবা প্রাচীন বাজার হতে উৎপত্তি হয়েছিল? সম্ভবতঃ প্রাচীন রোমান নগরীসমূহের অবশিষ্টাংশ, গীর্জা এবং দুর্গসমূহকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের শহরগুলির উৎপত্তিকালে শহরগুলি বর্তমানকালের শহরগুলি অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল এবং এই ক্ষুদ্র শহরগুলির লোকবসতি ছিল খুবই ঘন। আধুনিক শহরগুলির অধিবাসীদের ন্যায় মধ্যযুগের শহরের জনগণ সুখে বাস করত না। শহরের বাড়িগুলির সৌন্দর্য বলে কিছু ছিল না, পথ-ঘাটগুলি ছিল অপরিসর, পিচ্ছিল, আবর্জনাপূর্ণ ও দুর্গন্ধময়। অধিকাংশ বাড়ি ছিল কাঠের। এইগুলিতে আগুন লাগার ভয় ছিল, বাইরের বণিকদল 'টোল' বা ট্যাক্স ছাড়া শহরে প্রবেশ করতে পারত না।

বহু গীর্জা বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বহু শহর গড়ে উঠেছিল। এই শহরসমূহের উপর কর্তৃত্ব করতেন যাজকগণ। এই শহরগুলির মালিক ছিল ধর্মাধিষ্ঠানসমূহ। 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধের সময় যাজক ও অন্যান্য লোকদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থ পেলে যাজকগণ নগরের উপর নিজের অধিকার বিক্রয় করে দিতেন। এইরূপে বহু নগর স্বাধীন হয়ে গেল।

গিল্ড বা বণিক-সভা গঠনঃ শহরে বিভিন্ন শ্রেণীর বণিক ও কারিগরেরা দিজেদের স্বার্থরক্ষা ও পরস্পরকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘ গঠন করত। এইসকল সঙ্ঘকে বলা হত "গিল্ড" বা নিগম। তাঁতী, ছুতার, মুচী, কামার, কুমোর প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের নিয়ে পৃথক পৃথক গিল্ড গঠিত হয়েছিল। শিল্পীদের এই গিল্ডগুলি

অনেক জনকল্যাণমূলক কাজও করত। কোনও কারিগরের মৃত্যু হলে বা কোনও কারিগর অসুস্থ হলে গরীব পরিবারকে সাহায্য করা হত

মধ্যযুগের শহর
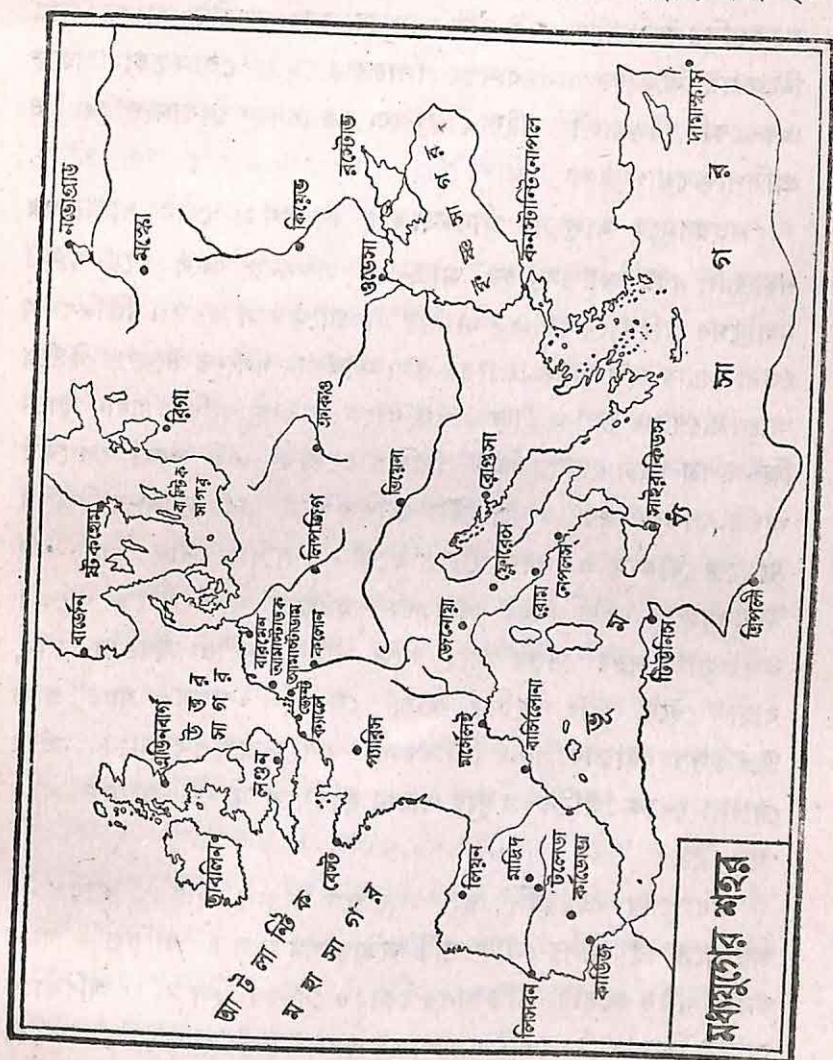
এই সঙ্ঘের অর্থ হতে। এরা গীর্জা বা বিদ্যালয় নির্মাণের জন্যও সাহায্য করত। কারিগর ছাড়া ব্যবসায়ীদেরও সঙ্ঘ ছিল। শহরের শিল্পী ও ব্যবসায়ীদল যৌথজীবন যাপন করত বলে শহরগুলি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে শিল্পী ও ব্যবসায়ী প্রথায় যে-সকল শহর

বড় হয়েছিল তাদের মধ্যে অ্যাটওয়ার্গ, অ্যামলকি, কোলন জেনোয়া ও ভিনিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে শহরগুলির প্রতিপত্তি এতই বৃদ্ধি পায় যে, তারা স্বাধীন রাষ্ট্রের ন্যায় নিজেরাই নিজেদের শাসনব্যবস্থা চালাতে থাকে। কোন কোন শহরে এক-একটি বিত্তশালী পরিবার রাজবংশের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা ও প্রতিপত্তি ভোগ করত।

শহরসমূহে মানুষের জীবনযাত্রার বিবরণ: রোম সাম্রাজ্যের শহরগুলি বর্বর জাতিসমূহের আক্রমণে একসময় ধ্বংস হয়ে যায়। মধ্যযুগের অধিকাংশ লোকই ম্যানরে বা গ্রামে বাস করত। জিনিসপত্র কেনা-বেচার জন্য হাট-বাজারের এবং তীর্থস্থান দর্শনের উদ্দেশ্যে গীর্জার আশেপাশে বহু লোক ভীড় করতে থাকে। এরা বাণিজ্যপ্রধান স্থানে জিনিসপত্র বেচা-কেনার জন্য মিলিত হতো। এই সকল লোকের খাওয়া-থাকার জন্য বহু হোটেল স্থাপিত হলো এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দোকান ও গুদাম তৈরি হলো। বাণিজ্যপ্রধান স্থান এবং গীর্জাসমূহকে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগের শহরগুলি গড়ে উঠতে থাকে। কতকগুলি শহর সেতুর ধারে গড়ে উঠে। নদীর অগভীর স্থান, যাহা হেঁটে পার হওয়া যায়, সে-সকল স্থানেও শহর গড়ে উঠেছিল। রাস্তাগুলির মিলনস্থল, পোতাশ্রয়, যেখানে নদীর মোহনা থেকে জিনিসপত্র দূরে পাঠান হতো সে সকল স্থানেও শহর গড়ে উঠে।

মধ্যযুগের শহরগুলি ছিল আয়তনে অত্যন্ত ছোট। আয়তনের অনুপাতে শহরগুলির লোকবসতি অত্যন্ত ঘন ছিল। বাড়িগুলি গায়ে গায়ে নির্মিত হতো। বাড়িগুলির কোনও সৌন্দর্য ছিল না। অধিকাংশ বাড়িই ছিল কাঠের তৈরি। আগুন লাগার ভয় বাড়িগুলিতে যথেষ্ট ছিল; কিন্তু জলের কোনও ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। শহরের রাস্তাগুলিও ছিল অত্যন্ত অপরিষ্কার। রাস্তায় প্রায়ই শূকর ও কুকুরের পাল ঘুরত। বাড়িগুলি হতে বাড়ির বাসিন্দাগণ পথিকের গায়ে প্রায়ই আবর্জনা ও ময়লা জল ফেলত। রাস্তার বিপরীত

দিকের বাড়িগুলির বারান্দা বেঁকে অন্যের বাড়ির দিকে প্রসারিত হয়ে রাস্তাগুলি ঢেকে ফেলত ; সূর্যের আলো রাস্তায় পড়ত না।

চোর-ডাকাতের ভয়ে সেকালের শহরগুলি প্রাচীরবেষ্টিত থাকত। রাত্রিবেলা শহরের ফটকসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হতো। রাস্তায় ভাল আলোর ব্যবস্থা ছিল না। বড় বড় হোটেলের মালিকরা তাদের দরজার সম্মুখে লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখতেন। চৌকিদাররা লাঠির মাথায় লণ্ঠন বেঁধে পাহারা দিত। শহরগুলিতে আমোদ-প্রমোদের কোনও অভাব ছিল না। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল যাদুকরের খেলা, কুকুরের দৌড়, মোরগের লড়াই এবং নানারূপ অভিনয় প্রভৃতি। গ্রামের লোকেরা এই সব দেখতে শহরে এসে ভীড় করত। শহরের "মেয়র" বা শাসনকর্তা যখন জমকালো পোশাক পরে রাস্তায় বের হতেন তাঁকে দেখতে ভীড় হতো। সকলেই তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করত। মেয়র বা শাসনকর্তা, কয়েকজন সহকারী নিয়ে নগর শাসন করতেন। বার্তাবাহক চিৎকার করে লোকদের ডাকত এবং বাজারে দাঁড়িয়ে জরুরী খবর জানাতো। প্রতি শহরে একটি গীর্জা ও বড় বাজার থাকত। ছুটির দিন বা অবসর সময়ে শহরবাসীরা গীর্জা বা বাজারে মিলিত হতো। দোকানদাররা তাদের মালপত্র ভালভাবে গুছিয়ে রাখত না। দরজার সামনে একটি তক্তায় জিনিসপত্র রেখে দোকানের ভিতরে দোকানদার তার নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। দোকানের উপরিভাগে একটি কাঠের ফলকে দোকানে যে জিনিস পাওয়া যেত তার তালিকা থাকত। শহরের এক-একটি রাস্তায় এক-এক প্রকার জিনিস পাওয়া যেত। শহরে যে-সকল মাল উৎপাদিত হতো তা নিয়েই শহরের ব্যবসা চলত। বাইরে থেকে কোনও মাল শহরে আসলে বাণিজ্য-শুল্ক লাগত।

শহরসমূহের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ ও 'বুর্জোয়া' শব্দের উৎপত্তি : শহরের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল ব্যবসায়ী ও কারিগর। ব্যবসা করে এবং শিল্পকর্মে নিয়োজিত হয়ে তারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। এই অর্থ দিয়ে তারা রাজা ও জমিদারের নিকট হতে লিখিত-

ভাবে বিশেষ অধিকারসমূহ আদায় করে নিত। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজার এবং ঘরোয়া বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যারণদের অপরিমেয় অর্থের প্রয়োজন হতো। শহরের অধিবাসীদের নিকট হতে টাকা পেয়ে রাজা এবং ব্যারণগণ নগরসমূহের উপর হতে নিজেদের অধিকার বিক্রয় করে দিতেন। এইরূপ বিক্রয়পত্রের নাম 'চার্টার' বা সনন্দ। চার্টারের বলে অনেক শহরের অধিবাসীরা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করেছিল। ইটালি ও জার্মানির অনেক বড় বড় শহর রাজাদের নিকট হতে সনদ পেয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছিল।

শহরে নূতন যে-সকল ব্যবসায়ী, শিল্পী এবং ভূমিহীন কৃষক আসত তারা শহর বা বার্গের দেওয়ালের বাইরে থাকত। এদের ফাওবার্গ বা সাবার্ব বলা হতো। এই ফাওবার্গ বা সাবার্বদের নিরাপত্তার জন্য দেওয়াল প্রয়োজন হতো এবং জনসংখ্যার আধিক্য শহরের পূর্ববর্তী সীমান্ত লঙ্ঘন করে নূতনভাবে দেওয়াল দিবার আবশ্যকতা দেখা দিত। ফাওবার্গগণ 'বার্জজেস' বা 'বার্গার' নামেও পরিচিত ছিলেন। এইরূপে একটি নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি দেশে তৃতীয় শ্রেণী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারা 'বুর্জোয়া' শ্রেণীরূপে আবির্ভূত হলেন। মঠ-প্রধান ও যাজক-শাসিত কতকগুলি শহরেও এইরূপে 'বুর্জোয়া' শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিল। অবশ্য সকল শহর বা বার্গেই যে এইরূপ হয়েছিল তা নয়।

॥ অনুশীলনী ॥

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগে শহরগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
২। গিল্ডের জনহিতকর কার্যাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
৩। কি উদ্দেশ্যে গিল্ড গঠন করা হয়েছিল ?
৪। মধ্যযুগে শহরগুলি কিভাবে গড়ে-তোলা হতো ?
৫। মধ্যযুগে শহরগুলি কিভাবে স্বায়ত্ত-শাসন অধিকার লাভ করেছিল ?
৬। মধ্যযুগে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব কিভাবে ঘটেছিল ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। শহরের বিকাশে ক্রুসেডের ভূমিকা আলোচনা কর।

২। গিল্ড কি উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছিল? গিল্ডের কার্যক্রম সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। মধ্যযুগের শহরের মানুষের জীবনযাত্রা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। চার্টার বা সনন্দ বলতে কি বোঝ? মধ্যযুগের শহরগুলির স্বায়ত্ত-শাসন লাভে চার্টারের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। মধ্যযুগের ইউরোপের শহরগুলিতে আমোদ-প্রমোদের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। গিল্ড কাকে বলে?

২। চার্টার কাকে বলা হত?

৩। মধ্যযুগে শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রধান কয়েকটি শহরের নাম কর।

৪। বুর্জোয়া বলতে কি বোঝ?

৫। বার্জেস বা বার্গার কাদের বলা হতো?

৬। মধ্যযুগের শহরগুলি কোথায় কিভাবে গড়ে উঠতে থাকে?

———

॥ ১০ ॥ মধ্যযুগে সুদূর প্রাচ্যের ইতিহাস ঃ তাং-যুগে চীনদেশের ঐক্য, আইন-ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং শিক্ষা-ব্যবস্থা ঃ

চীনে সুই বংশীয় শাসকদের পতনকালে দেশব্যাপী বিপ্লবের মধ্যে সম্রাটের সেনাপতি লি-ইউয়ানের অভ্যুদয় হয়েছিল। লি ইউয়ান শেষ পর্যন্ত সিংহাসন অধিকার করতে সমর্থ হন। পুত্র লি সি মিন-এর অসীম শৌর্যবীর্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্যই তাঁর এই অসামান্য সাফল্য সম্ভব হয়েছিল। লি-ইউয়ান ইতিহাসে (৬১৮-৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ) সম্রাট কাও সু নামে পরিচিত। শেষ বয়সে ধর্মের প্রতি কাও সু-র প্রবল আগ্রহের ফলে তিনি তাঁর সুযোগ্য পুত্র লি সি মিন-এর হস্তে রাজ্যভার তুলে দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন (৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ)। এর পর লি সি মিন সম্রাট তাই সুই নাম ধারণ করে চীনদেশের সিংহাসনে বসলেন। তাই সুই ছিলেন একজন সুদক্ষ যোদ্ধা। তিনি মধ্য এশিয়ার সুদূর অঞ্চল পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি চীনা বাহিনীর পুনর্গঠন করেছিলেন এবং যুদ্ধোপকরণের উন্নতির দ্বারা নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। পূর্ব মোঙ্গলিয়া এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার কতকগুলি খণ্ডজাতি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল। কাশগড়, ইয়ারকন্দ, সমরকন্দ ও বোখরা চীনা বাহিনীর পদানত হয়েছিল। তাই সুই-এর মৃত্যুকালে চীনসাম্রাজ্য পশ্চিমে রুশ তুর্কীস্থান এবং দক্ষিণে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তাই সুই-এর পুত্র কাও সুই-এর রাজত্বকালে চীনদেশের এই বিশাল সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঙ বংশের সম্রাট মিং হুয়াং চীনের পশ্চিম দিকের দেশগুলিতে তুর্কী ও তিব্বতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিরাট সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঙ সাম্রাজ্যের মত এত বৃহৎ আয়তনের ভূখণ্ড চীনের ইতিহাসে আর কোনও বংশের রাজত্বকালে দেখা যায় নি।

সম্রাট তাই সুই সাম্রাজ্যের আইন-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। একদা কারাগার পরিদর্শনকালে তিনি দেখলেন যে,

২৯০ জন দণ্ডিত ব্যক্তি মৃত্যুর অপেক্ষায় কালযাপন করছে। তখনই তিনি তাদের কৃষিকর্ম করবার জন্য মাঠে প্রেরণ করলেন। তাদের নিকট থেকে কেবলমাত্র এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন যে, মাঠের কাজের পর তারা আবার কারাগারে প্রত্যাবর্তন করবে। প্রত্যেকেই এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল এবং সেজন্য প্রীত হয়ে সম্রাট তাদের মুক্তি দান করেছিলেন। অতঃপর তাদের নিয়ম হলো—যে কোনও ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড মঞ্জুর করবার পূর্বে সম্রাট তিনদিন উপবাসী থেকে চিন্তা করে দেখবেন যে, ভ্রমবশতঃ কোন নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ডিত না হয়। মন্ত্রিগণ যখন সম্রাটকে দস্যুতা নিবারণের জন্য কঠোর আইন প্রবর্তন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, তখন তিনি বললেন, "কঠোর" শাস্তি প্রবর্তনের চেয়ে দস্যুতা নিবারণে আরও ভাল উপায় হলো রাষ্ট্রের ব্যয় হ্রাস, করভার লাঘব, সাধু কর্মচারী নিয়োগ এবং প্রজাদের খাওয়া-পরার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। তাঙ বংশের সম্রাট সুয়ান সুং-এর রাজত্বকালে (৭১২-৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি প্রাণদণ্ড রদ, কারাগার ও আইন-আদালতের সুব্যবস্থা করেছিলেন।

ভারতবর্ষে যখন বৌদ্ধধর্ম পতনোন্মুখ তখন বৌদ্ধ শ্রমণদের চীন-দেশে আগমনের বিরাম ছিল না। এই সংযোগের ফলে চীনে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং চিকিৎসাশাস্ত্র যথেষ্ট উন্নতিলাভ করে। তাঙ যুগেও কনফুসীয় পদ্ধতিমত শিক্ষিত ও বিদ্বৎসমাজ প্রশাসন ও সমাজের কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঙ যুগে তাওপন্থীরা মুষ্টিযোগ, ভেষজ-চর্চা, স্পর্শমণির সন্ধান এবং 'সঞ্জীবনী রসায়নের' গবেষণা করতেন। এই যুগে চুম্বক, কম্পাস প্রভৃতি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও তারা করেছিলেন। কিন্তু কনফুসীয় পণ্ডিতদের বিজ্ঞানচর্চার দিকে দৃষ্টি ছিল না। চীনদেশে বৌদ্ধ শ্রমণদের অবদান এই যুগেই। তাঙ যুগে অতিরিক্ত আরও চারিটি দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল। কোরিয়া দেশটি চীনা সংস্কৃতিকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল। তাঙদের সাংস্কৃতিক প্রভাব ইন্দোচীনেও প্রসার লাভ করেছিল। এমন কি তিব্বতী ধর্মেও চীনা বৌদ্ধগণের ভাবধারা অনুপ্রবেশ করেছিল।

॥ তাঙ শাসনের নানা দিক ॥

আইন : সুপ্রাচীনকাল থেকে চীনদেশের আইনবিধি কনফুসিয়াসের শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। বারবার রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলেও চীনাদের রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য ঐ সকল আইনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। হান-পরবর্তী যুগের বিশৃঙ্খলার ফলে আইনের যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা গিয়েছিল তাঙ সম্রাটগণ তার সংশোধন করেন।

কাব্য ও সাহিত্য : তাঙ রাজাদের তিনশ' বছরের রাজত্বকালকে 'কাব্যের স্বর্ণযুগ' বলা হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে পদ্য রচনাই ছিল এযুগের প্রতিভার প্রকৃত পরিচয়। চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে খ্যাতি ছিল লি-পোর। অনেক ছোটগল্প রচিত হয়েছিল তাঙ যুগে, কিন্তু সেগুলি লেখা হয়েছিল পণ্ডিতী ভাষায়, সুতরাং সাধারণ ব্যক্তির তা বোধগম্য ছিল না। এ যুগের শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চ্যাং চি হো এবং হ্যান-ইউ।

শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা : তাঙ সম্রাটদের শাসনকালে চীনদেশে বহু সরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সরকারী কাজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ঐসব বিদ্যালয়ে দেওয়া হতো। ইতিহাস, গণিত, ভূগোল এবং কবিতা ছিল পাঠ্যবস্তু। এছাড়াও কনফুসিয়াসের উপদেশগুলিও ছাত্রদের বিশেষভাবে বুঝতে হতো। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা তাঙ সম্রাটদের আমল থেকে চীন-দেশে চালু হয়। যে-সব ছাত্র পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করত তারা চিন-শি উপাধিতে ভূষিত হতো। প্রতি তিন বছর অন্তর এই পরীক্ষা হতো। কাগজ-প্রস্তুত চীনারা এই সময় উদ্ভাবন করে।

চা-এর প্রবর্তন : চীনে চা-পান আরম্ভ হয়েছিল বহুপূর্বে—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হতে। দক্ষিণ অঞ্চল হতে উত্তর চীনে চায়ের ব্যবহার প্রসার-লাভ করেছিল। 'চা' শব্দটি চীনা। চা-পানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে তাঙ যুগের কবিরা কবিতা লিখতে অবহেলা করেন নি। ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক লেখক 'চা-সাহিত্য' নামক গ্রন্থে চা'র বিভিন্ন চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন।

মুদ্রণশিল্প ঃ তাঙ সম্রাটদের শাসনকালে চীনদেশে মুদ্রণ শিল্পের বিকাশ ঘটে। খুব সম্ভব জাপান থেকে সর্বপ্রথম কাঠের তৈরি ব্লকের সাহায্যে চীনারা ছাপার কাজ শুরু করে। তুন হুয়াং গুহা হতে জগতের প্রাচীনতম ছাপা-গ্রন্থ উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রন্থটি একটি বৌদ্ধসূত্র, ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কাঠের ব্লক হতে সর্বসাধারণের জন্য মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশ করা হয়।

চারুকলা ঃ সমস্ত পৃথিবীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নিদর্শন তাঙ শিল্পে দেখা যায়। এইসকল ভাস্কর্যে কোনও চীনা ভাবধারা নেই; আছে ইরাণী, গ্রীক ও ভারতীয় ভাবধারার প্রাচুর্য। প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ শিল্প ব্যতীত মৃৎশিল্পেরও অনেক বস্তু ভূগর্ভে পাওয়া গিয়েছে। তাঙ যুগের সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণের মৃতদেহকে নর্তকী, ভৃত্য, প্রহরী, অভিনেতা প্রভৃতির মাটির মূর্তি দিয়ে ঘিরে রাখা হতো। সম্রাটরা ছিলেন ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু সেই শিল্প ছিল বিদেশী, আর মৃৎশিল্পের জন্ম দেশীয় কর্দমে, মৃৎশিল্পীর উৎসাহ যোগাত সর্বসাধারণ। উ-তাও স্থুয়ান ছিলেন তাঙ যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর।

চীনের মৃৎশিল্প

তাঙ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ তাঙ শাসনকালে চীনের সঙ্গে বিদেশের সংযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে চীনদেশে বহু বিদেশীর সমাগম ঘটে। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাজধানী চাং আন চীনের প্রবেশ পথের প্রধান ঘাঁটি ছিল। চীনের দক্ষিণে সমুদ্রপথে বিদেশের সঙ্গে সংযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ক্যাণ্টন বন্দরে বাণিজ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি করা হতো।

স্থলপথেও চীন থেকে উটের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে বাণিজ্যযাত্রা হতো মধ্য এশিয়া, ইরাণ ও বাইজানটিয়ামের নানাস্থানে। ইতিহাসে

এই স্থল-বাণিজ্যের পথ রেশম পথ বা সিল্ক রুট নামে বিখ্যাত। রপ্তানির আরও দুইটি প্রধান সামগ্রী ছিল মসলা ও চীনা বাসন। বিদেশ হতে চীনে যেসকল দ্রব্য আমদানী হতো তাদের মধ্যে প্রধান ছিল হাতীর দাঁত, ধূপ, তামা, কচ্ছপের চাড়ি এবং গণ্ডারের শৃঙ্গ।

আরবগণ ও মধ্য এশিয়ার নানা যাযাবর জাতি গোবি মরুভূমির ভিতর দিয়ে পণ্যবাহী ঘোড়া ও উট নিয়ে চীনে আসত। ফিরবার সময় তারা রেশমী কাপড়, ব্রোঞ্জের আয়না ও চীনামাটির সৌখিন জিনিস নিয়ে যেত। তাঙ যুগে আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎপাদন সামগ্রী ছিল কাগজ।

তাঙ শাসনকালে চীনদেশ কি ধনদৌলতে, কি ব্যবসা-বাণিজ্যে, সমৃদ্ধির শীর্ষে আরোহণ করেছিল। সেইজন্য এই যুগকে বলা হয় সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ।

তাঙ যুগের কৃষিব্যবস্থা ঃ তাঙ যুগে কৃষির উন্নতিও অব্যাহত ছিল। কৃষির উন্নতির জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা তাঙ সম্রাটরা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম তাঙ সম্রাট জমি পুনর্বণ্টন করেছিলেন। ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা বৃহৎ জমিদারি গঠনের উদ্যোগ ব্যর্থ করবার চেষ্টাও পুনঃ পুনঃ করা হয়, যদিও সে চেষ্টা সফল হয়নি। তাঙ যুগে ভূমিহীন প্রজা ভূমির মালিক হয়েছিল এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। সরকারী উদ্যোগে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছিল, ফলে কৃষি-উৎপাদন অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাঁধ তৈরি করা হতো। দক্ষিণ চীনের চাষীরা বছরে দু'বার ধান চাষ করত। ইক্ষু ও চায়ের উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা করা হতো।

চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও চীনের বাইরে চীন-সভ্যতার প্রসার ঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে হান সম্রাট মিঙ্‌তির রাজত্বকালেই চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার শুরু হয়। একাজে ব্রতী হয়েছিলেন ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ নামে দুই ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ও প্রচারক। তবে চীনে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার আরম্ভ হয় চতুর্থ শতকে মহাপণ্ডিত কুমারজীব, পরমার্থ প্রমুখ প্রচারকের উদ্যোগে। এই সময় চীন-ভারত বাণিজ্যিক সংযোগ ছাড়াও ধর্মীয় যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে।

তখন থেকেই গৌতম বুদ্ধের দেশ ও তাঁর সাধনার স্থানগুলি দেখবার জন্য অনেক চীনা বৌদ্ধ ভারতে আসতে থাকেন। চীন সম্রাটদের আনুকূল্যে অনেক চীনা পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন চর্চার জন্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান করেন। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন চতুর্থ শতকে ভারত থেকে বহু সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে চীনে নিয়ে যান। তিনি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ বিনয়পিটক চীনা-ভাষায় অনুবাদ করেন।

চীনের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম যে স্থান লাভ করেছিল তার স্থায়িত্ব বা মর্যাদা কোনদিনই ক্ষুণ্ণ হয়নি। কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশগুলির উপর চীনা সংস্কৃতির, বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল অপরিসীম। কোরিয়া চীনের সামরিক শক্তিকে যথাসাধ্য প্রতিহত করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেইসঙ্গে বৌদ্ধধর্মকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিল। তাঙদের সাংস্কৃতিক প্রভাবের গণ্ডির মধ্যে ইন্দোচীনও এসে পড়েছিল, এমনকি তিব্বতী ধর্মেও চীনা বৌদ্ধদের ভাবধারা অনুপ্রবেশ করেছিল। চীনে সুই বংশীয়দের শাসনকাল হতেই জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার নিঃশব্দ গতিতে এগিয়ে চলেছিল। জাপানে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে চীনা সংস্কৃতির নব নব উপকরণের আবির্ভাব 'নারা যুগের' জাপানী সাহিত্য, শিল্প ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল।

হিউয়েন সাঙ-এর ভারত ভ্রমণ ও প্রত্যাবর্তন—এর ফলাফল : চীনের জলপথ ও স্থলপথ মুক্ত হওয়ার ফলে উভয় পথে চীনের সঙ্গে বহির্জগতের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হয় এবং সেই সঙ্গে বহু বিদেশী চীনদেশে আসতে থাকে। চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর থেকে বহু চীনা তীর্থযাত্রী দুর্গম পথ অতিক্রম করে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান দেখতে ভারতে আসেন। হিউয়েন সাঙ ছিলেন এরূপ একজন তীর্থযাত্রী। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত ভারতের ইতিহাসে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে আলোক-স্তম্ভস্বরূপ। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দশকে হোনান প্রদেশে হিউয়েন সাঙ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন জনৈক পণ্ডিত রাজকর্মচারীর

চতুর্থ পুত্র। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে উনত্রিশ বছর বয়সে তারিম উপত্যকার মধ্য দিয়ে পর্যটন করে ইসিককুল হ্রদ, তাসখন্দ ও সমরখন্দ অতিক্রম করে বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষের গান্ধারে এসে উপনীত হন। ভারতে তিনি বৌদ্ধদের অনেক পবিত্র তীর্থস্থান পরিদর্শন করেন, নানা
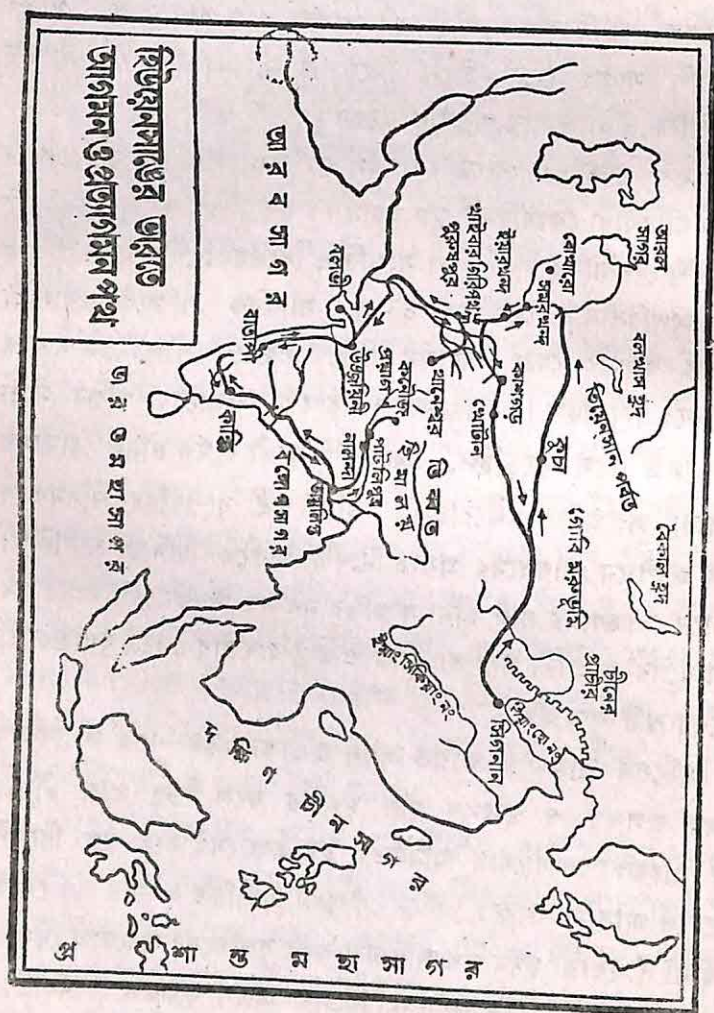
সংঘারামে ধর্মশিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনা করেন, অনেক শাস্ত্র তিনি উদ্ধার করেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রদেশ পরিভ্রমণ করে এই দেশের জনসাধারণ ও ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

ষোল বছর কাল ভারতে অবস্থানের পর তিনি ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থলপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি দক্ষিণের পথ ধরে পামির মালভূমি অতিক্রম করে এবং কাশগড়, ইয়ারখন্দ ও খোটান হয়ে চীনদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ ৮৫৭ খানি গ্রন্থ ভারতবর্ষ হতে চীনদেশে এনেছিলেন এবং এদের মধ্যে ৭৫ খানি গ্রন্থ তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ভারতবর্ষ হতে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী বিশ বছরকাল তিনি অধ্যাপনা এবং শাস্ত্রগ্রন্থগুলির চীনা অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই গ্রন্থগুলি বৌদ্ধ-ধর্মকে একান্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। ফলে চীনে যেমন বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছিল তেমনি ভারতবর্ষ ও চীনদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছিল। হিউয়েন সাঙের ভারত-বৃত্তান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার একটি মূল্যবান উপাদান।

সুং যুগে চীন (৯৬০-১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ): সুং বংশীয় শাসকদের রাজত্বকালে খণ্ড-বিখণ্ড চীনের পুনঃসংযোগে কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। তাঙ বংশীয় শাসকগণ বাহুবলকে আশ্রয় করে সুবৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন। সুং সম্রাটগণ বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একত্র করতে কোনরূপ শক্তির প্রয়োগ করেন নি। নানা দুর্ভোগ ও দুর্বিপাকের পর খণ্ডিত দেশের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার আগ্রহ জেগেছিল এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের চেতনায়ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তাঙ বংশীয় শাসকদের সময় সময় গণ-বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হলেও সুং সাম্রাজ্য প্রজাবর্গের সম্মতি ও সমর্থনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল।

সু সম্রাট সেন সুং-এর (১০৬৮-১০৮৫ খ্রীঃ): শাসনকালে তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রী ওয়াং আন-সি এক নববিধান প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি প্রাচীন ঐতিহ্য বা কনফুসীয় ধর্মনীতিকে মূলতঃ অস্বীকার করেননি, ক্ষেত্র বিশেষে কেবলমাত্র নীতির রদ-বদলকেই সমর্থন করেছিলেন। ওয়াং-এর গৃহীত নববিধানের ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা। ওয়াং-এর বিধান অনুযায়ী সু সম্রাটগণ বাণিজ্য-নীতিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন রাখেন। প্রত্যেক

জেলায় উৎপন্ন ফসল থেকে রাজস্ব ও জেলার প্রয়োজন মেটানো হতো। উদ্বৃত্ত ফসল সরকার কিনে রাখতেন ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে। এজন্য প্রত্যেক জেলায় রাষ্ট্রের নিজস্ব শস্যগোলা স্থাপন করা হলো এবং সেই গোলায় করলব্ধ স্থানীয় শস্য মজুদ রাখবার ব্যবস্থা হলো। প্রয়োজনমত সরকার গোলার শস্য অন্যত্র পঠিয়ে বিক্রয় করতেন।

সুদখোর মহাজনদের কবল হতে প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য রাষ্ট্র-কর্তৃক খুবই অল্প সুদে কৃষিকাজের জন্য কৃষকদের ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফসল কাটার পর কৃষককে ঐ টাকা পরিশোধ করতে হতো।

প্রত্যেক খণ্ড জমির উপর যাতে ন্যায্য কর ধার্য হয় তার জন্য ভূমি জরিপ করে নতুনভাবে কর ধার্য হয়েছিল।

ওয়াং আন-শির আইনের বলে স্থাবর ও অস্থাবর সব সম্পত্তির ওপরই কর ধার্য করা হয়েছিল।

সেনাবিভাগের ব্যয় কমাবার উদ্দেশ্যে অনেক উদ্বৃত্ত সৈনিক ছাটাই করা হয়। অপরপক্ষে কোন পরিবারের একাধিক যুবক থাকলে তাদের পুলিশ বা প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ সুং যুগে নানাবিধ পদ্য রচনা, প্রবন্ধ, বিশেষতঃ ইতিহাস গ্রন্থের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল। প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ থাকবার ফলেই এই যুগে ইতিহাস রচনায় প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন জু মা কুয়াং। সুং যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা বিশ্বকোষ। তাঙ কবিরা ছিলেন 'পেশাদার' কবি কিন্তু সুং যুগে পণ্ডিতেরা রাজকার্য বা ধর্মচর্চার অবসরে কবিতা লিখতেন। ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য, পদ্য ও গদ্য রচনা প্রভৃতি মানবীয় ও রাজনৈতিক বিষয় সমূহের চর্চার মধ্যেই সুং প্রতিভা আবদ্ধ ছিল না। জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ, উদ্ভিদবিদ্যা ও গণিত-শাস্ত্রেও নানা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বারুদের আবিষ্কার ইতিপূর্বেই হয়েছিল। বারুদ ব্যবহার হতো বাজি প্রস্তুতের জন্য। সুং চিত্রশিল্প

উৎকর্ষের চরম শিখরে উঠেছিল। প্রাকৃতিক রম্যদৃশ্য অঙ্কনই শিল্প-নিষ্ঠার আদর্শ হয়ে উঠেছিল।

॥ যুয়ান যুগ (১২৮০-১৩৬৮ খ্রীঃ) ॥

মোঙ্গলদের ইতিহাস—কুবলাই খান: ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খান মোঙ্গল জাতির খান-খানান্ বা সর্বাধিনায়করূপে নির্বাচিত হন। কুবলাই-এর চীনা নাম সি সু। তাঁর রাজত্বকালকে বলা হয় মোঙ্গল শাসনের স্বর্ণযুগ। ইউরোপ ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বিশাল মোঙ্গল সাম্রাজ্যের তিনি একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়ার মোঙ্গল শাসক বিদ্রোহী হলেও কুবলাই-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও নিহত হয়। ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই চম্পা রাজ্য (বর্তমান কাম্বোডিয়া) আক্রমণ করেন। কুবলাই খান কয়েকবার জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ব্রহ্মদেশে কুবলাই খানের সামরিক অভিযান অপেক্ষাকৃত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। শ্যামদেশ কুবলাইকে কর প্রেরণ করত। বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য কুবলাই-এর দূত জলপথে দক্ষিণ ভারত এমন কি আফ্রিকার ম্যাডাগাসকারেও এসে উপনীত হয়েছিল। কুবলাই-এর রাজধানী ছিল পিকিং শহরের কাছে ক্যামবালাক শহরে। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তিব্বতীয় রীতিনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ধর্মের ব্যাপারে কুবলাই উদার মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও চীনের কনফুসীয় মতবাদ ও ইসলাম ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

কুবলাই খাঁ

১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই-এর মৃত্যু হয়; তখন তাঁর বয়স আশি
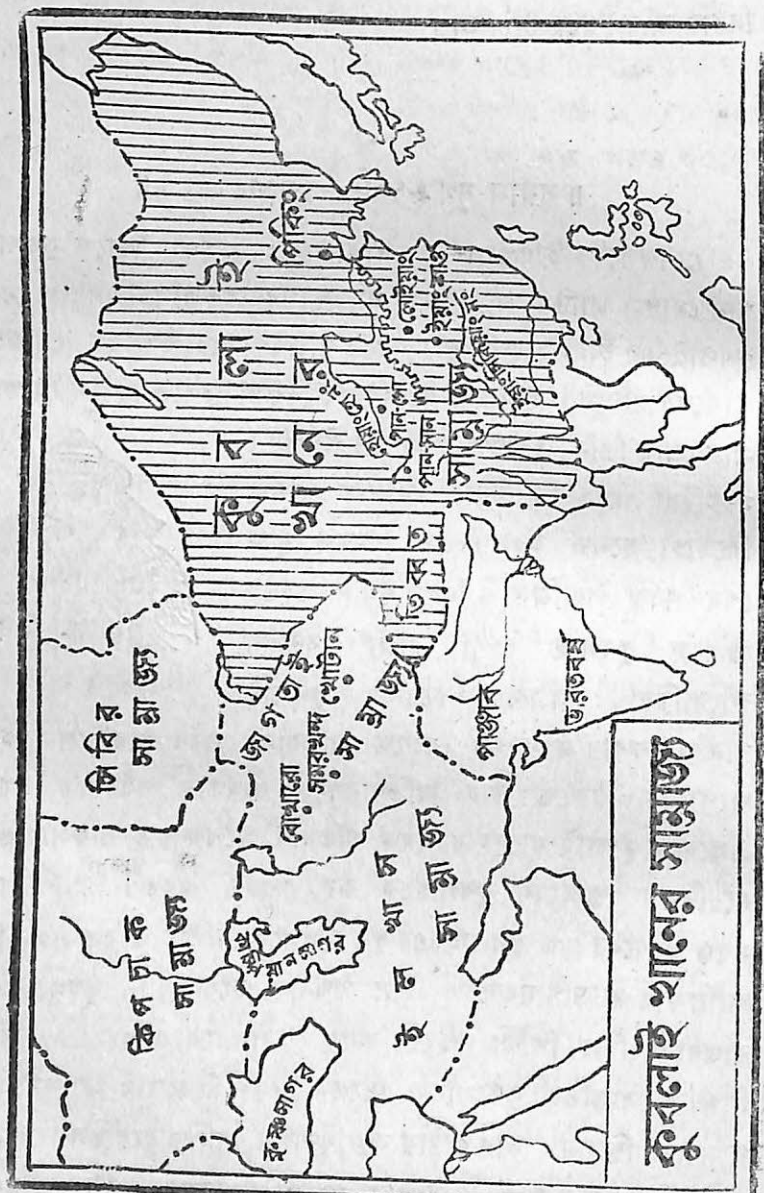
বছর। তাঁর বংশধররা ছিল দুর্বল ও অল্পায়ু, তাঁর মৃত্যুর পর মোঙ্গল সাম্রাজ্য আরও ৭৪ বৎসর স্থায়ী হয়েছিল।

মার্কোপোলোর বিবরণঃ কুবলাই-এর শাসনপদ্ধতি ও সাম্রাজ্যের অবস্থার কথা মার্কোপোলোর বিবরণ হতে বিশেষভাবে জানা যায়। মার্কোপোলো ছিলেন একজন ভেনিসদেশীয় পর্যটক, মাত্র একুশ বছর বয়সে মার্কোপোলো তাঁর পিতা ও পিতৃব্যের সঙ্গে ভেনিস থেকে চীনের পথে যাত্রা করেন। ভেনিস থেকে পিকিং পৌঁছিতে তাঁদের সময় লেগেছিল সাড়ে তিন বছর। এই সময়ের মধ্যে মার্কোপোলো মোঙ্গলদের ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। চীনা ভাষাও তিনি মোটামুটি আয়ত্ত করেছিলেন। পিকিংয়ে তরুণ মার্কোপোলো অল্পদিনের মধ্যেই কুবলাই-এর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। কুবলাই মার্কোপোলোকে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

মার্কোপোলো

এক সময়ে মার্কোপোলো চীনের একটি প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। সরকারী কাজের দায়িত্ব নিয়ে মার্কোপোলোকে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। দীর্ঘকাল এইভাবে কুবলাই খানের কাছে কর্মরত থেকে ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে মার্কোপোলো জলপথে দেশে ফিরে যান। দেশে ফিরে তিনি এক সুন্দর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচনা করেন। মার্কোপোলোর ভ্রমণকাহিনী দুঃসাহসিক অভিযানের বিবরণমাত্র নয়। এর মধ্য দিয়ে দুই মহাদেশে যাতায়াতের যে ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যায় তার মূল্য অপরিসীম।

মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেন, চীন ছিল বিরাট এবং সমৃদ্ধিশালী দেশ। দেশে বড় বড় শহর ছিল এবং শহরের পৌরব্যবস্থা খুবই উন্নত ছিল। প্রশাসনের সুবিধার জন্য এক রকম ডাক-ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছিল। 'রিলে' প্রথায় অশ্বারোহীরা এই ডাক নিয়ে দিনে ১০০ মাইল পর্যন্ত যেতে পারত।

মার্কোপোলো তাঁর বিবরণে কুবলাই-এর দুইটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছিলেন। একটি পরমত সহিষ্ণুতা এবং অপরটি বিশ্বপ্রেম। কুবলাই স্বয়ং ছিলেন তিব্বতী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। তা সত্ত্বেও তিনি

অন্যান্য ধর্মকে বৌদ্ধধর্মের সমান সুযোগ-সুবিধা দান করতে কুণ্ঠিত
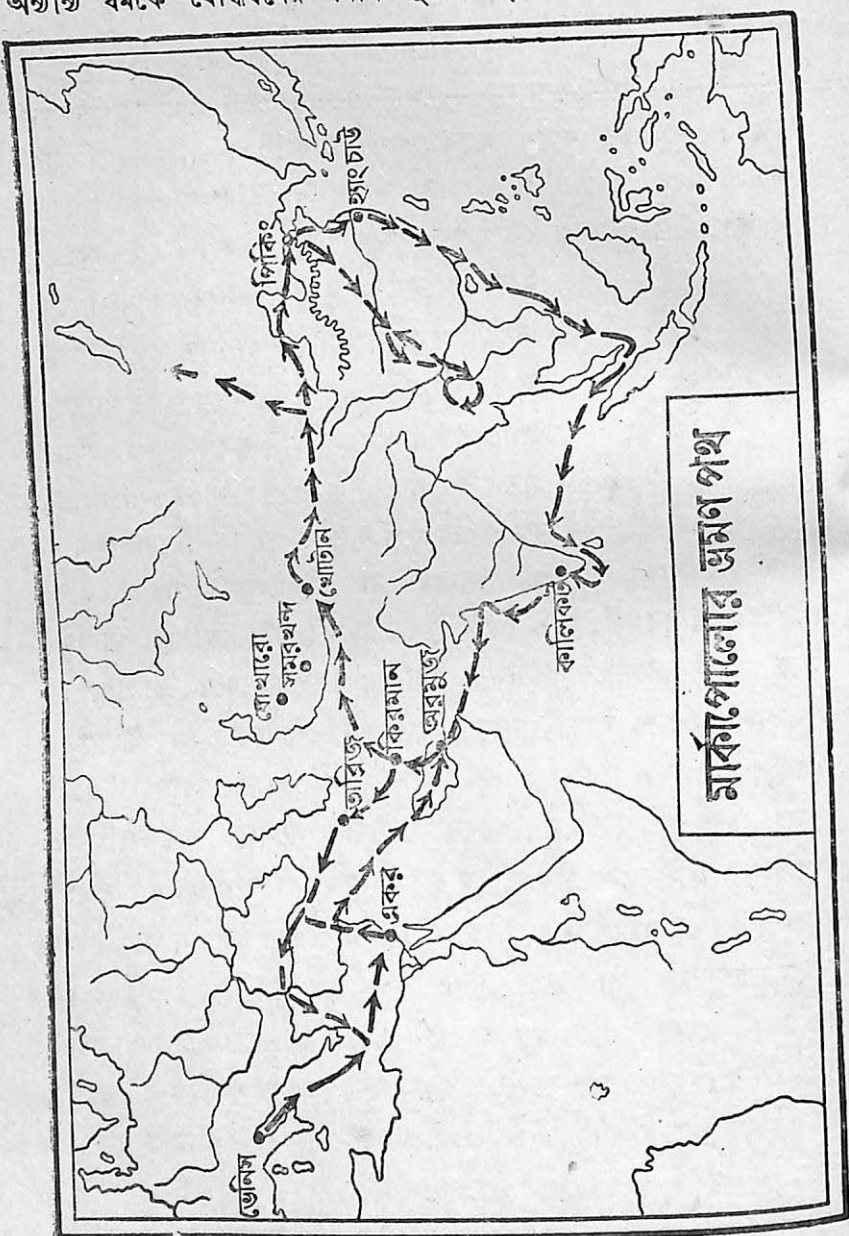
হন নি। বৌদ্ধ শ্রমণ, তাও পুরোহিত ও মুসলমান মোল্লা সকলেই করদান হতে সমভাবে নিষ্কৃতি পেয়েছিল। চীনাদের প্রতি

অবিশ্বাসের ফলেই কুবলাই বিদেশী পোষণ করেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ কর্মে বিদেশী নিয়োগ করা হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে। চীনাদের প্রতি তাঁর অবিশ্বাসই সেই কারণ। দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি চীনাদের প্রায়ই দেওয়া হতো না। চাকরির পরীক্ষা বন্ধ করা হয়েছিল যাতে নিয়োগের ব্যাপারে বিদেশীদের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে না হয়। চীনাদের নিকট হতে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কুবলাই-এর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আহম্মদ নামে জনৈক অত্যাচারী বিদেশী মুসলমান।

মার্কোপোলোর বিবরণী থেকে জানা যায়, কুবলাই খান চীনদেশে কাগজের টাকা চালু করেছিলেন। এই কাগজ রাজকোষে জমা দিলে তার পরিবর্তে সোনা পাওয়া যেত। মার্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত মধ্যযুগের চীনদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রামাণ্য দলিল।

॥ মধ্যযুগে জাপান ॥

চীনের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে জাপান অন্যতম। প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপ নিয়ে জাপান গড়ে উঠেছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে জাপানের জনসমাজ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এই ভাগগুলি ছিল পিতৃকেন্দ্রিক। সম্রাট নামেমাত্র এই ভাগগুলির শাসক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পিতৃকেন্দ্রিক গোষ্ঠীর প্রধান। বংশানুক্রমিক ক্ষমতা অধিকার এবং গোষ্ঠীগত ঐক্যের প্রতি জাপানীদের অনুরাগ ছিল প্রবল। প্রাচীন লোকগাথা থেকে জানা যায় যে, কিউস্যুর একটি গোষ্ঠী ইয়ামাতো সমভূমিতে বসতি স্থাপন করে। তারপর ক্রমে ক্রমে অন্যান্য গোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। কালক্রমে কিউ-স্যু গোষ্ঠী জাপানের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করে। কিউ-স্যু গোষ্ঠীর নেতারা অন্যান্য গোষ্ঠীর পুরোহিতদের মধ্যে প্রধান বলে স্বীকৃতি লাভ করে। ইয়ামাতো পুরোহিতরাই জাপানে সর্বপ্রথম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

মধ্যযুগে জাপানে সমাজ-ব্যবস্থা : সপ্তম শতাব্দীতে চীনের অনুকরণে জাপানে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গঠিত হয়। অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা গোষ্ঠী পরিচালিত জাপানের মত একটি ছোট দেশের পক্ষে আদৌ উপযোগী ছিল না। জাপানের বিভিন্ন প্রদেশের গোষ্ঠীগত পার্থক্য এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ এত বেশী ছিল যে, কেন্দ্রের কোন কর্মচারীর পক্ষে এই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা অসম্ভব ছিল। প্রাদেশিক কর্মচারীরা প্রদেশের শাসনকাজ চালাত। স্থানীয় অভিজাত পরিবারদের মধ্য থেকে এইসব কর্মচারী নিয়োগ করা হতো। এঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করতেন, কেন্দ্রের কোন নিয়ন্ত্রণ এঁদের উপর ছিল না। রাজকর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বাধীন মনোবৃত্তি এবং কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্যের ফলেই জাপানে সামন্ত-প্রথা প্রচলিত হয়েছিল।

চীনের অনুকরণে জাপানে জমিবণ্টন ব্যবস্থা এবং রাজকর্মচারী নিয়োগ প্রথা প্রবর্তিত হলেও দু'য়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। চীনে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই রাজকর্মচারী পদের উপযুক্ত বিবেচিত হতো। এসব ক্ষেত্রে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত বা অভিজাত শ্রেণীর বিচার করা হতো না। কিন্তু জাপানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হলেও সব-সময় এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী উচ্চ সরকারী চাকরি পেত না। একমাত্র অভিজাত শ্রেণীর মধ্য হতেই কেন্দ্রীয় রাজপদে কর্মচারী নিয়োগ করা হতো। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারে দক্ষ কর্মচারীর অভাব দেখা দিয়েছিল।

জমিবণ্টন ব্যাপারেও জাপানে পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কৃষিজমি বণ্টন করা হতো। এর জন্য কোন কর লাগত না। বাকি জমি প্রজাদের মধ্যে বিলি করা হতো। সরকারের প্রধান আয় ছিল ভূমিরাজস্ব। এই রাজস্ব সংগ্রহের জন্য গরীব প্রজাদের উপর অতিরিক্ত হারে কর ধার্য করা হতো। এই কর দেওয়া প্রজাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। অনন্যোপায় হয়ে প্রজারা তাদের জমি কোন অভিজাত পরিবারকে হস্তান্তর করত।

এইভাবে জাপানে জমিদার বা জায়গীরদারের সৃষ্টি হয়। এঁরা সবাই ছিলেন হয় সরকারী কর্মচারী নতুবা স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তি।

অনেকসময় দেখা যেত, সাধারণ কৃষক সরকারী কর পরিশোধ করবার জন্য উৎপন্ন ফসলের একাংশ অভিজাতদের হাতে তুলে দিত। তাঁরা সরকারী কর্মচারীদের উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করে এই শস্য-কর রাজকোষে জমা দিতেন না। এই অবস্থা চলতে থাকায় অবশেষে রাজকোষ দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে করমুক্ত জমির পরিমাণ বাড়তে বাড়তে জাতীয় ভূসম্পত্তি বলতে কিছুই রইলো না। এইভাবে সামন্তগণ বা জমিদাররাই শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হলো।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর অনেকগুলি জমিদার এক হয়ে এক-একটি বৃহৎ জমিদারীর সৃষ্টি হয়। এদের মালিকদের বলা হতো দাইমিয়ো।

বৃহৎ পরিবার সমূহের প্রতিরোধ : সামন্ত-প্রথা প্রবর্তনের ফলে জাপানে সম্রাটের মর্যাদা নষ্ট হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে। সামন্ত গোষ্ঠীরা সম্রাটের সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাঁকে শক্তিহীন করে ফেলে। এইসব সামন্তগোষ্ঠীর মধ্যে ফুজিয়ারা পরিবার ছিল অন্যতম। এই পরিবার জমিদারী ও অর্থনৈতিক শক্তির বলে সম্রাটের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তা ছাড়া রাজপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় ফুজিয়ারা গোষ্ঠীর বংশমর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। কোন নাবালক সম্রাটপদে অভিষিক্ত হলে, ফুজিয়ারাগণই তাঁর অভিভাবক হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ফুজিয়ারাগণই সম্রাটের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে আরও দুটি অভিজাত গোষ্ঠী ক্ষমতা লাভের আশায় পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এরা হলেন টায়রা ও মিনামোতো পরিবার। প্রথমে টায়রা পরিবার জয়লাভ করে কিয়োতোর রাজসভায় স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু কিছু-দিনের মধ্যে মিনামোতো পরিবারের নেতা ইয়োরিতোমো টায়রাদের

তাড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে। ইয়োরিতোমো শোগান অর্থাৎ মহা-সেনাপতি উপাধি গ্রহণ করেন।

মিকাডোর চূড়ান্ত ক্ষমতা: জাপানের সম্রাটকে বলা হতো মিকাডো। জাপানের প্রচলিত ধারণা হলো মিকাডো হলেন সূর্য-সম্ভূত, আধা দৈবশক্তির ধারক ও বাহক এবং চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। প্রাচীনকালে জাপানে শিণ্টো ধর্মমত প্রচলিত ছিল। এই ধর্মের ঐতিহ্য অনুযায়ী মিকাডো বা জাপানের সম্রাট একাধারে হলেন দেশের প্রধান ধর্মীয় নেতা এবং পুরোহিত, আবার একচ্ছত্র রাজনৈতিক শাসনক্ষমতারও অধিকারী। ইয়ামতো সম্রাটের এই দ্বৈত ভূমিকা জাপানের ঐতিহাসিক বিকাশে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে জনসাধারণের শ্রদ্ধা সম্রাটের উপর থেকে কমে যায়। সেই সময় সামন্ত গোষ্ঠীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করায় সম্রাট শুধুমাত্র মর্যাদা ও সম্মানের পাত্র হয়ে রইলেন। শোগান সামন্তরাই সম্রাটের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়।

চীনের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক: সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনের সঙ্গে জাপানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। চীনের উন্নত সভ্যতা জাপানকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। প্রথম প্রথম জাপানীরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই চীনাদের অনুকরণ করত। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে জাপানে চৈনিক সভ্যতা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হতে থাকে। কয়েক শ' বছরের বৌদ্ধধর্মের প্রচারের মধ্য দিয়ে চীনা সভ্যতা জাপানকে প্রভাবিত করে। বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে জাপানীরা চীনে যেত এবং সেখান থেকে দেশে ফিরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হতো। ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ শো-তোকুর চেষ্টায় এক বিরাট সাংস্কৃতিক দল চীনে পাঠানো হয়। এই দলের প্রতিনিধিরা দীর্ঘদিন চীনে অবস্থান করে সে দেশের দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করে দেশে ফিরে এসে স্ব স্ব বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। চীনের

কনফুসীয় তত্ত্বও জাপানে গৃহীত হয়েছিল। সপ্তদশ শতকে তোকুগাওয়া পরিবার শোগান পদ অধিকার করার পর কনফুসীয় মতবাদ জাপানে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।

কেবল সাংস্কৃতিক দিক দিয়েই নয়, রাজনৈতিক দিক দিয়েও জাপান ছিল চীনের অনুগামী। চীনের সম্রাটরা বার বার জাপান জয়ের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে চীনের অনুরূপ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। দীর্ঘকাল চীনের সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে থাকায় জাপানের নিজস্ব একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠে।

শোগান এবং তার ক্রমিক অবনতি ঃ জাপানে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন শোগান। শোগান সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে তাঁর পক্ষে জাপান শাসন করতেন। তোকুগাওয়াবংশীয় শোগানরা ৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতায় এসেছিলেন। শোগান যে-সকল সামন্ত তাঁদের বিরোধিতা করেছিল তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে অনুচরদের মধ্যে সেই সম্পত্তি পুনর্বণ্টন করেছিলেন। যে-সকল সামন্ত তাদের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন তোকুগাওয়াবংশীয় শোগানগণ তাদের সম্পত্তি পূর্বের ন্যায় তাদের রাখতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করবার ফলে তোকুগাওয়া শোগানরা বিদ্রোহের সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া শোগানের নির্দেশে দাইমিওদের বছরের কিছু কাল ইয়েদোতে থাকতে হতো এবং জমিদারাতে তাদের পরিবারবর্গকে ভাল ব্যবহার ও আনুগত্যের প্রতিভূস্বরূপ রাখতে হতো। দাইমিওরা দু'ভাগে বিভক্ত ছিলেন—(ক) বংশানুক্রমিক সামন্ত ও (খ) বহিঃসামন্ত। বংশানুক্রমিক সামন্তগণ তাদের ক্ষমতা অব্যাহত রাখবার উদ্দেশ্যে তোকুগাওয়াবংশীয় শোগানদের সমর্থন করত এবং বহিঃসামন্তগণ (তোজামা), যারা জাপানের প্রায় অর্ধাংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তাঁরা কোনও সন্ধিতে আবদ্ধ হতে পারত না। তা ছাড়া বিভেদ ও শাসনের নীতি প্রযুক্ত করে শোগান তাঁর ক্ষমতা যাতে বিনষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। বহু সম্প্রদায়

তোকুগাওয়া শোগানদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকুক তা চাইলেন না ; তা সত্ত্বেও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে শোগানদের বিরুদ্ধে কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়।

সামুরাই শ্রেণী ঃ মর্যাদার দিক দিয়ে শোগানের পরেই ছিলেন দাইমিয়োগণ (ভূমির জমিদারগণ)। তাঁরা কতকগুলি দাইমাইয়েটস্ বা ভৌমিক বিভাগের উপর আধিপত্য করতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন কয়েকটি সম্প্রদায়ের প্রধান। পুরানো জাপানের যোদ্ধাশ্রেণী সামুরাইদের উপর তাঁরা ক্ষমতার জন্য নির্ভরশীল ছিলেন। দেশের যোদ্ধাশ্রেণী নিয়েই সামুরাই-দল গঠিত হয়েছিল। যোদ্ধা-রূপে তাদের প্রায়ই দেশরক্ষার এবং তাদের প্রধানদের স্বার্থরক্ষার জন্য আহ্বান করা হতো। অধিকাংশ সময়ই অলস জীবন-যাপনকারী দেশের জনসাধারণ এদের উপর নির্ভরশীল ছিল।

সামুরাই

বুশিডো ঃ ইউরোপের দেশগুলিতে যেমন সামন্তপ্রথার সঙ্গে 'শিভ্যালরি' নামে আচরণ বিধি জন্ম নিয়েছিল, জাপানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সামুরাইগণকে কতকগুলি নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হতো। এই শৃঙ্খলা মধ্যযুগে সামরিক ও নৌ-বাহিনীর জনগণকেও মেনে চলতে হতো। সর্বদা সত্য কথা বলা, রাজা ও খ্রীষ্টধর্মকে মেনে চলা, স্ত্রীলোকদের রক্ষা করা ও বিপদাপন্ন লোকদের সাহায্য করা এবং শত্রুর কাছে পিছু না হটা—এগুলিই নিয়ম-শৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই নীতিগুলিকে বুশিডো বলা হয়। এই কর্তব্য পালনে অক্ষম হলে জাপানীরা আত্মহত্যা করত। জাপানী ভাষায় এর নাম হারিকিরি।

॥ অনুশীলনী ॥

১। **সংক্ষিপ্ত উত্তরীভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। তাই সুইয়ের শাসনকাল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। চীনের ইতিহাসে কোন সময়কে সুবর্ণযুগ বলা হয় ?

৩। হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে এসেছিলেন কেন ?

৪। সুং সম্রাট সেন সুং-এর শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি ?

৫। কুবলাই খান কে ছিলেন ? তাঁর চীনা নাম কি ? তিনি কোথায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?

৬। মার্কোপোলো কে ছিলেন ? তাঁর সঙ্গে কুবলাই খানের সম্পর্ক কেমন ছিল ?

৭। জাপানী সমাজে মিকাডোর ক্ষমতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৮। বুশিডো কাকে বলে ?

৯। দাইমিয়ো কাদের বলা হয় ?

১০। 'শোগান' বলতে কাদের বুঝায় ?

২। **রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ**

১। তাঙ যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

২। তাঙ রাজত্বকালের শিক্ষাচর্চা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। তাঙ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য কি ভাবে পরিচালিত হতো বুঝিয়ে লেখ।

৪। তাঙ যুগকে সমৃদ্ধির স্বর্ণ-যুগ বলা হয় কেন ?

৫। চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ ও তার ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৭। সুং সম্রাট সেন সুং-এর মন্ত্রী ওয়াং আন-সি-র শাসনসংস্কার সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৮। কুবলাই খানের শাসনকাল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৯। মার্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে চীনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের যে-চিত্র পাওয়া যায় তা তোমার নিজের কথায় প্রকাশ কর।

১০। মধ্যযুগে জাপানের সমাজ-ব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১১। ফুজিয়ারা পরিবারের একচ্ছত্র শাসন জাপানে কি ভাবে প্রবর্তিত হয়, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১২। জাপানী শাসন-ব্যবস্থায় সামুরাই ও শোগান-সম্প্রদায়ের স্থান নির্ণয় কর।

৩। **সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ**

(ক) দাইমিয়ো, (খ) সামুরাইশ্রেণী, (গ) বুশিডো, (ঘ) হারিকিরি।

৪। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। — ইতিহাসে কাও সু নামে পরিচিত।

২। চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন —।

৩। — যুগকে বলা হয় সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ।

৪। কুবলাই খানের চীনা নাম —।

৫। জাপানের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন —।

৫। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) কাও সু কে ছিলেন ?

(খ) তাঙ বংশের কোন সম্রাটের রাজত্বকালে প্রাণদণ্ড রদ হয়েছিল ?

(গ) চীনে কোন রাজবংশের শাসনকালে মুদ্রণশিল্পের বিকাশ হয় ?

(ঘ) চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কে ?

(ঙ) হিউয়েন সাঙ কে ছিলেন ?

(চ) চীনে মোঙ্গল শাসনের প্রবর্তক কে ?

(ছ) কুবলাই খান কত খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল সিংহাসন অধিকার করেন ?

(জ) মার্কোপোলো কে ছিলেন ?

(ঝ) শোগান কাদের বলে ?

(ঞ) দাইমিয়ো কাদের বলা হতো ?

(ট) হারিকিরি কি এবং কাহাকে বলে ?

গুপ্ত পরবর্তী যুগ (পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী)ঃ গুপ্তযুগে মগধকে কেন্দ্র করে ভারতে যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তা বিলুপ্ত হয়। ভারতবর্ষ আবার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে গান্ধার ও পাঞ্জাব হতে মালব পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে শক্তিশালী হূণ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর দক্ষিণে ছিল বলভী রাজ্য। উত্তর ভারতের অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে দিল্লীর নিকটে পুষ্যভূতি বংশের থানেশ্বর, মৌখরী বংশের কনৌজ, মগধ ও মালব রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের রাজ্যদ্বয় এবং নেপাল, কামরূপ ও উড়িষ্যা ছিল প্রধান। মালবের অন্তর্গত দশপুরের যশোবর্মন একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। স্কন্দগুপ্তের শাসনকালে ভারতে হূণ আক্রমণ দেখা দিয়েছিল।

হূণ আক্রমণঃ হূণরা ছিল মোঙ্গল জাতির এক শাখা। এরা বর্বর, নির্মম ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বলে সর্বত্র খ্যাত ছিল। মধ্য এশিয়ায় বহু দলে বিভক্ত হয়ে এরা বাস করত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে হূণরা পঙ্গপালের মত ইউরোপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করতে লাগল। প্রায় একই সময় হূণ জাতির আর একটি শাখা পারস্য এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করল। এরা **শ্বেত হূণ** নামে ইতিহাসে খ্যাত। হূণরা হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে গান্ধার অধিকার করে নিল এবং জনসাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করতে লাগল। পঞ্চম শতকের শেষভাগে উত্তর-পশ্চিম ভারত, পারস্য ও মধ্য এশিয়ার একাংশ জুড়ে হূণগণ এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। বাল্‌খ ছিল হূণ সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র।

আনুমানিক ৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে হূণ দলপতি তোরমান মধ্যভারত পর্যন্ত অধিকার করেন। তোরমানের পুত্র **মিহিরকুল** বা মিহিরগুল

পাঞ্জাবের শাকল (শিয়ালকোট) নগরে রাজত্ব করতেন। পূর্ব-মালব ও পাঞ্জাব তাঁর অধিকারে ছিল। আনুমানিক ৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে মগধের গুপ্তরাজ বালাদিত্য এবং মন্দাশোরের অধিপতি যশোবর্মন মিহিরকুলকে পরাজিত করেন। ৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে মিহিরকুলের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর হূণগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে রাজত্ব করতে থাকে। এই সময় মগধের গৌরব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় এবং থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ ও কণৌজের মৌখরী বংশ প্রাধান্য লাভ করে।

হূণ আক্রমণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব: মিহিরকুলের পরাজয় ও মৃত্যুর পর হূণেরা ভারতে কোনও শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করতে না পারলেও তাদের উপদ্রব একেবারে বন্ধ হয়নি। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগেও উত্তর-পশ্চিম ভারত হূণ আক্রমণে বিব্রত ছিল। থানেশ্বরের পুষ্যভূতিবংশীয় রাজগণ এবং কনৌজের মৌখরীবংশীয় নরপতিদের হূণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। মিহিরকুলের পরাজয়ের পর হূণশক্তির যে পতন শুরু হয়েছিল তা অবিরাম গতিতে চলে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সকল হূণ বসবাস করত কালক্রমে তারা হিন্দু সমাজে মিশে গিয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতিতে হূণদের কোন বিশিষ্ট অবদান নেই, বরং তাদের আক্রমণে ভারতের অনেক সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া গুপ্তযুগে ভারতে যে-বিশাল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, পঞ্চম শতকের মধ্যভাগ থেকে হূণদের বার বার আক্রমণে সেই সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে যায়। এটাই হলো ভারতবর্ষে হূণ আক্রমণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

গুপ্তযুগের পরবর্তী অবস্থা—হর্ষবর্ধন: গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্ত হূণ-জাতির আক্রমণ প্রতিহত করে গুপ্তসাম্রাজ্যকে সাময়িকভাবে রক্ষা করেছিলেন সত্য, কিন্তু হূণদের ক্রমাগত আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য হীনবল হয়ে পড়ে। গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে ষষ্ঠ শতাব্দীতে কনৌজের মৌখরীবংশ নিজ শক্তি বিস্তার করতে থাকে। এই বংশের উল্লেখযোগ্য প্রথম রাজা **প্রভাকরবর্ধন**। তাঁর রাজধানী ছিল থানেশ্বর।

ইনি হূণ, গুর্জর, মালব প্রভৃতি জাতি-উপজাতিকে প্রতিহত করে মালব ও গুজরাটে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি কনৌজের মৌখরীবংশের রাজা গ্রহবর্মনের সঙ্গে তাঁর কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মালবরাজ দেবগুপ্ত এবং গৌড়রাজ শশাঙ্কের সম্মিলিত আক্রমণে তাঁর ভগ্নীপতি কনৌজরাজ গ্রহবর্মন নিহত এবং ভগ্নী রাজ্যশ্রী কারারুদ্ধ, এই দুসংবাদ পেয়ে রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন কিন্তু দেবগুপ্তের মিত্র শশাঙ্ক কর্তৃক তিনি নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের হত্যার সংবাদ পেয়ে হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ইতিমধ্যে রাজ্যশ্রী কনৌজের কারাগার হতে পলায়ন করে বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হর্ষবর্ধন যখন ভগ্নীর সন্ধান পান তখন রাজ্যশ্রী অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতির উদ্যোগ করছিলেন। হর্ষবর্ধন রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করে থানেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পর মৌখরীরাজ্যও হর্ষের শাসনাধীনে আসে। কনৌজ ও থানেশ্বর রাজ্যদ্বয় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় এক বিশাল ও শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই সম্মিলিত রাজ্যের রাজধানী হর্ষ কনৌজে স্থানান্তরিত করেন। প্রথমে হর্ষ 'রাজপুত্র' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ; ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূর্ণ রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন।

হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধনের রাজ্যবিস্তার : হর্ষের প্রধান শত্রু ছিলেন গৌড় নরপতি শশাঙ্ক। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করবার উদ্দেশ্যে হর্ষবর্ধন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ হন। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষের অভিযানের ফলাফল জানা যায় না। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে শশাঙ্ক পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করেছিলেন সে বিষয়ে কোন

সন্দেহ নেই। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষ মগধের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন এবং উত্তরবঙ্গও জয় করেছিলেন। তাঁর মিত্র ভাস্করবর্মন পরবর্তীকালে বাংলার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেছিলেন। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষ কঙ্গোদ রাজ্য (বর্তমান উড়িষ্যার
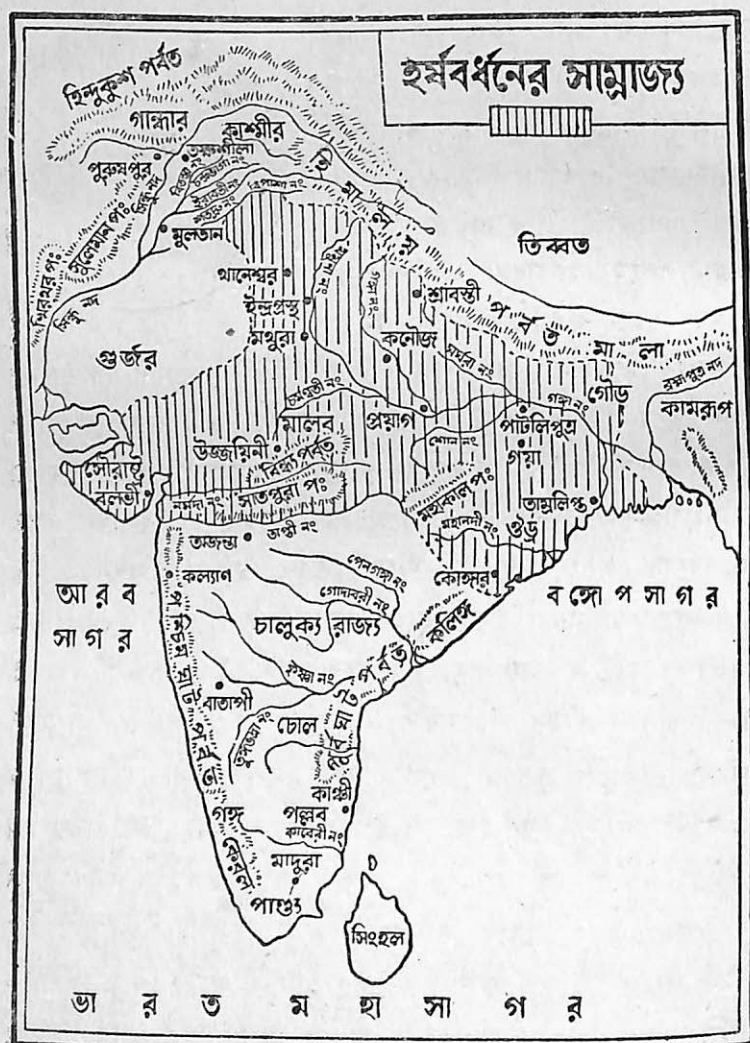
গঞ্জাম জেলা) অধিকার করেন। পশ্চিম ভারতের বলভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেনকে হর্ষ পরাজিত করেছিলেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতে উল্লেখ আছে যে, হর্ষ সিন্ধু এবং কাশ্মীরেও অভিযান করেছিলেন।

৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হর্ষবর্ধন নর্মদা নদা অতিক্রম করে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু চালুক্যরাজের নিকট পরাজিত হওয়ার ফলে হর্ষ নর্মদা নদীর দক্ষিণে রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হননি। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপন করে হর্ষবর্ধন "সকলোত্তরোপথনাথ" উপাধি গ্রহণ করেন।

হর্ষের রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চল, বর্তমান উত্তর-প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যার কঙ্গোদ অঞ্চল। পশ্চিমে বলভীর রাজা দ্বিতীয় ধ্রুবসেন এবং পূর্বে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মন তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করেছিলেন।

হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণ-বিবরণঃ বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ পশ্চিম চীন হতে প্রায় তিন হাজার মাইল দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল যাত্রাপথ পরিভ্রমণ করে ৬৩১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে গান্ধারে উপনীত হন। প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি পামির, কাশগর, ইয়ারখন্দ, খোটান এবং লোপনর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। হিউয়েন সাঙ ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশ পরিদর্শন করে এই দেশের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে মূল্যবান বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

হিউয়েন সাঙ

হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন যে, হর্ষবর্ধন তাঁহার রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা ব্যক্তিগতভাবে দেখাশুনা করতেন। হিউয়েন সাঙ হর্ষকে অক্লান্ত পরিশ্রমীরূপে উল্লেখ করেছেন। হর্ষবর্ধনের শাসনকালে গুপ্তযুগের তুলনায় দণ্ডবিধি কঠোরতর হলেও দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল। হিউয়েন সাঙ স্বয়ং একাধিকবার দস্যুর কবলে পতিত হয়েছিলেন। হর্ষের রাজত্বকালে কনৌজ উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরে পরিণত হয়েছিল। এই বিশাল শহরটিতে প্রায় একশ' বৌদ্ধ

বিহার এবং দু'শ দেবমন্দির ছিল। কনৌজে অনুষ্ঠিত ধর্ম-সম্মেলনের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ হিউয়েন সাঙ লিপিবদ্ধ করেছেন। পুরোভাগে হস্তীপৃষ্ঠে বুদ্ধমূর্তিসহ এক শোভাযাত্রায় হর্ষ, হিউয়েন সাঙ এবং ভাস্করবর্মনের সঙ্গে যোগদান করে এই ধর্ম-সম্মেলনে উপস্থিত হতেন। শোভাযাত্রা সমাপ্তির পর বুদ্ধমূর্তির পূজা ও গণভোজ হতো।

প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর গঙ্গা ও যমুনা নদীর পবিত্র সঙ্গমস্থল প্রয়াগে হর্ষবর্ধন ৭৫ দিন স্থায়ী এক ধর্মোৎসবের আয়োজন করতেন। যে-প্রান্তরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হত তার নাম ছিল 'দানক্ষেত্র' বা 'সন্তোষ ক্ষেত্র'। হর্ষের আমন্ত্রণক্রমে হিউয়েন সাঙ ষষ্ঠ বার্ষিকী দানোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, যখন সব ধনরত্ন ফুরিয়ে যেত, তখন হর্ষবর্ধন নিজের বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ডগুলি 'পর্যন্ত দান করে ভগ্নী রাজ্যশ্রীর দেওয়া একখণ্ড সামান্য বস্ত্র পরিধান করে ভিক্ষুকের বেশে দানক্ষেত্র পরিত্যাগ করতেন।

হর্ষ স্বয়ং বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রাজকীয় ভূ-সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তিনি বিদ্বান ও সাহিত্যসেবীদের জন্য ব্যয় করতেন। ঐ যুগের প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দা মহারাজ শ্রীহর্ষের অর্থসাহায্য লাভ করেছিল।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ প্রাচীন ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল **নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়**। হিউয়েন সাঙ দীর্ঘকাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র চর্চা করেছিলেন। আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের তদানীন্তন সকল রাজা ও ধনী ব্যক্তির অকৃপণ দানে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত হতো। বহির্ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দানেও এটি পরিপুষ্ট হয়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে সারিবদ্ধভাবে ৮টি কলেজ বা মহাবিদ্যালয় বিরাজ করত। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও বেশী। এই সব ছাত্র ও শিক্ষকেরা এসেছিলেন কোরিয়া,

মঙ্গোলিয়া, জাপান, চীন, তিব্বত, সিংহল, বুখারা প্রভৃতি দেশ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র
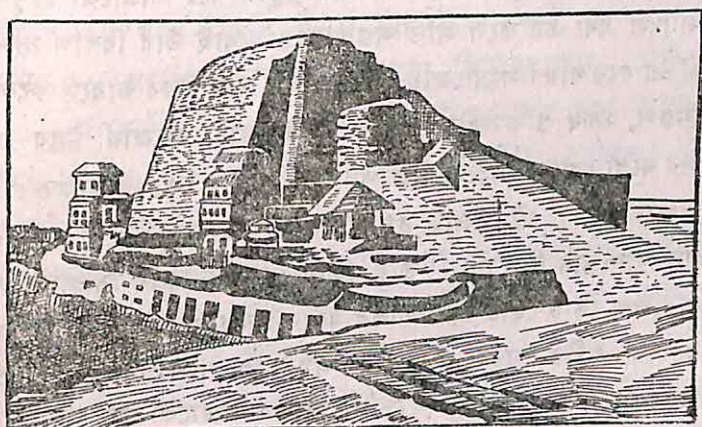
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

সেইসময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও দার্শনিক।

কেবল বৌদ্ধশাস্ত্র নয়, এখানে বেদ, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, সাংখ্য, দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদির পঠন পাঠনেরও ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রায় একশ জন শিক্ষক ঐসব বিষয় ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন।

বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য একশ'টি গ্রামের রাজস্ব দেওয়া হতো। এখানকার পড়াশুনার মান ছিল খুবই উন্নত। বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকেও দৃষ্টি রাখা হতো। নালন্দায় অধ্যয়ন শেষে যাঁরা উপাধি লাভ করতেন, সমাজে তাঁদের স্থান ছিল খুবই উঁচু। হিউয়েন সাঙ ও অন্যান্য বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণে ভারতবাসীর সৎ এবং সরল জীবনযাত্রার যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে, তার মূল কারণ হলো এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থা।

॥ হর্ষবর্ধনের পরবর্তী ইতিহাস (অষ্টম—দ্বাদশ শতাব্দী) ॥

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব ঃ রাজপুতদের ইতিহাস ঃ হর্ষবর্ধনের কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পরে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং এর ফলে অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতে **কনৌজ, কামরূপ, মগধ ও কাশ্মীর** প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য পরস্পর বিরোধ লেগেই থাকত।

কনৌজ ঃ এই রাজ্যটি হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। হর্ষবর্ধনের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর কনৌজের সিংহাসন লাভ করার জন্য ছোট ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। অবশেষে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে **যশোবর্মন** কনৌজের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি গৌড়ের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। তাঁর সভাকবি বাকপতিরাজের প্রাকৃত ভাষায় লেখা গৌড়বাহো কাব্যে এই ঘটনার বিষদ বিবরণ আছে। 'উত্তররামচরিত' প্রণেতা কবি ভবভূতিও তাঁর অন্যতম সভাকবি ছিলেন। অবশেষে কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের হস্তে যশোবর্মন পরাজিত হন। সঙ্গে সঙ্গে কনৌজের গৌরব সাময়িকভাবে লুপ্ত হয়ে যায়।

কামরূপ ঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় কামরূপ রাজ্যটি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হর্ষবর্ধনকে সাহায্য করেছিলেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ইনি তিব্বতীয়দের কনৌজ আক্রমণে সাহায্য করেন। ভাস্করবর্মন গৌড় রাজ্যের একাংশ অধিকার করেছিলেন। তাঁর সময় কামরূপ পূর্ব ভারতের একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়।

মগধ ঃ গুপ্তবংশের রাজত্বকালে মগধ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তী গুপ্তরাজগণের রাজধানী ছিল মগধ। গৌড়রাজ শশাঙ্ক মগধ অধিকার করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পরবর্তী গুপ্তবংশের আদিত্য সেন হর্ষবর্ধনের সহায়তায় মগধ অধিকার করেন। কনৌজরাজ যশোবর্মন পুনরায় মগধ দখল করেন।

কাশ্মীর ঃ উত্তর ভারতের একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল কাশ্মীর। ললিতাদিত্যের পূর্বপুরুষ দুর্লভ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কাশ্মীরে কর্কট রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজা চন্দ্রাপীড়কে চীন সম্রাট কাশ্মীরের রাজা বলে স্বীকৃতি দেন। চন্দ্রাপীড়ের ভাই ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় কনৌজরাজ যশোবর্মনের সাহায্যে তিব্বতরাজকে পরাজিত করেন। ললিতাদিত্য মালব, গুজরাট এবং সিন্ধুদেশের আরবগণকেও পরাজিত করেন। ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় বঙ্গদেশ পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন।

রাজপুত জাতি ও রাজপুত রাজ্য ঃ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ মুসলমান আক্রমণকারিগণ কর্তৃক বিজিত হওয়ার কাল পর্যন্ত, উত্তর ভারতে কয়েকটি শক্তিশালী রাজবংশের অভ্যুদয় হয়েছিল। এরা নিজেদের রাজপুত বলে পরিচয় দিতেন। এই রাজপুত রাজগণ কেবলমাত্র উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই খ্যাতিলাভ করেন নি, এঁরা সে সময়ে বিধর্মী মুসলিম রাজগণের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যে অপরিসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ দেখিয়েছিলেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। রাজপুত জাতির বীরত্ব ও মহত্ত্বের কাহিনী ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। রাজপুত রাজাদের কীর্তিকলাপকে কেন্দ্র করেই এ যুগের ইতিহাস গড়ে উঠেছিল। এজন্য অনেকে এই যুগকে 'রাজপুত যুগ' নামে অভিহিত করেছেন। জনশ্রুতি অনুসারে রাজপুত রাজারা নিজেদের সূর্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান যুগের অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে রাজপুতগণ হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত জাতির বংশধর। এই সকল জাতি ভারতের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে কালক্রমে ভারতীয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

ভারতের সুপ্রসিদ্ধ রাজপুত-বংশগুলির মধ্যে গুর্জর-প্রতিহার বংশ, জেজাকভুক্তির চান্দেল বংশ, মালবের পরমার বংশ, গুজরাটের

চৌলুক্য বংশ, আজমীয়ের চৌহান বংশ, চেদী রাজ্যের কলচুরি বংশ ছিল প্রধান।

গুর্জর-প্রতিহার রাজ্য ঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুর্জর-জাতি রাজপুতানার যোধপুর অঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন করে। গুর্জরদের নাম হতে এই অঞ্চল 'গুর্জরত্রা' বা 'গুজরাট' নাম গ্রহণ করে। রাজপুতানা ও গুজরাট ব্যতীত গুর্জর জাতি উত্তর ভারতের আরও কয়েকটি স্থানে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে বাস করত। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষপাদে গুর্জরগণ মালবের দক্ষিণ-পশ্চিমে আর একটি রাজ্য স্থাপন করেছিল। মালবেও একটি স্বতন্ত্র গুর্জর-প্রতিহার রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। উজ্জয়িনী ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর গুর্জর-প্রতিহারগণ উত্তর ভারতে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতনের পরে উত্তর ও মধ্যভারতে কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটে। এই সকল রাজ্যের স্থাপয়িতাগণ প্রায় সকলেই ছিলেন প্রতিহার সম্রাটের সামন্ত। প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয় সেই সুযোগে শক্তিশালী সামন্তগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।

চান্দেল রাজ্য ঃ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে জেজাকভুক্তির (বুন্দেলখণ্ড) চন্দেল্ল রাজপুত বংশ প্রাধান্য লাভ করে। চন্দেল্ল রাজাগণ প্রথমে গুর্জর-প্রতিহারদিগের সামন্ত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ডহল বা ত্রিপুরী (বর্তমান জব্বলপুর অঞ্চল) রাজ্যে চেদি বা কলচুরি রাজবংশের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

পরমার বা পবর রাজপুত্তগণ দশম শতাব্দীর শেষাংশে মালব অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করে। পরমার বংশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন **ভোজ** বা **ভোজরাজ**। ভারতের ইতিহাসে এবং কিংবদন্তীতে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে আছে।

খ্রীষ্টীয় দশম শতকে **চৌলুক্য** বা সোলাঙ্কি বংশীয় মূলরাজ প্রতিহার বংশের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে গুজরাটে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন

করেন। অনহিলবাড়া ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। এই বংশের রাজা প্রথম ভীমের রাজত্বকালে গজনীর সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন। দ্বিতীয় মূলরাজ এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। বহিরাক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লবে প্রতিহার সাম্রাজ্য যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং সামন্তগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করছিলেন তখন একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে গাহড়বাল বংশীয় রাজপুতগণ কনৌজ ও বারাণসীকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই বংশের বিখ্যাত রাজা ছিলেন জয়চাঁদ বা জয়চন্দ্র। জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর নির্বাচনের ব্যাপারে পৃথ্বীরাজ চৌহানের সঙ্গে তাঁর প্রবল বিরোধের সৃষ্টি হয়। তরাইনের যুদ্ধে জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজকে কোন সাহায্য করেননি। মুহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দীন আইবক ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চন্দাবারের যুদ্ধে জয়চাঁদকে পরাজিত ও নিহত করেন। গাহড়বাল রাজ্য মুসলিম অধিকারভুক্ত হলো। এই বংশ মাত্র একশ' বছর রাজত্ব করেছিল।

গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস : শশাঙ্ক

দীর্ঘকাল গৌড় গুপ্ত নরপতিদের অধীনে মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুপ্ত নরপতি মহাসেনগুপ্তের পতনের পর ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে মগধ ও গৌড়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সময় শশাঙ্ক নামক জনৈক ব্যক্তি গৌড়-বঙ্গে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। শশাঙ্কের রাজত্বকালে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে।

শশাঙ্কের প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বিহারের রোটাসগড়ে প্রাপ্ত একটি শীলের ছাঁচে "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক" লিপিটি আছে। ঐতিহাসিকগণ এ থেকে অনুমান করেন যে, শশাঙ্ক গুপ্তরাজ মহাশেনগুপ্তের অধীনে একজন সামন্ত ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে শশাঙ্কের অপর নাম ছিল নরেন্দ্র গুপ্ত এবং তিনি মহাসেনগুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। হিউয়েন সাঙ্ এবং বাণভট্ট শশাঙ্ককে গৌড়াধিপতি বলে উল্লেখ

করেছেন। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোনও একসময় গৌড়-বঙ্গের আধিপত্য লাভ করে শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণে (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের নিকট কানাসোনা) রাজধানী স্থাপন করেন।

শশাঙ্ক শম্ভুযশ নামক রাজাকে পরাজিত করে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর), উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) এবং কঙ্গোদ (বর্তমান উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা) অধিকার করেন। কঙ্গোদের নরপতিগণ ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কের আধিপত্য স্বীকার করেছিলেন। অনুমিত হয় যে, শশাঙ্ক পূর্ববঙ্গ জয় করেছিলেন এবং সমগ্র বাংলাদেশের উপর তাঁর প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়েছিল। তিনি মগধ জয় করেছিলেন এবং পশ্চিম-দিকে তাঁর রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল।

গুপ্তসম্রাটের অধীনে সামন্তরূপে জীবন আরম্ভ করে শশাঙ্ক সম্পূর্ণ স্বাধীন নরপতিরূপে জীবন অবসান করেন। তিনি থাণেশ্বর ও কনৌজের মত সুপ্রতিষ্ঠিত শত্রুকেও প্রতিরোধ করে বাংলায় রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর রাজ্য রক্ষা করেছিলেন। গৌড়রাজ শশাঙ্কের সময় বাংলাদেশ প্রথম উত্তর ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

ত্রি-রাষ্ট্র (পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট) বিরোধ ঃ

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে তিনটি শক্তিশালী রাজ-বংশের উদ্ভব হয়েছিল—মধ্যভারত ও রাজপুতানায় গুর্জর-প্রতিহার বংশ, গৌড়বঙ্গে পালবংশ এবং দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট বংশ। উত্তর ভারতের প্রভুত্ব নিয়ে এই তিনটি রাজবংশের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। শেষ পর্যন্ত প্রতিহাররাজ জয়লাভ করেন। পাল-বংশীয় ধর্মপালের সমসাময়িক প্রতিহার নরপতিদ্বয় ছিলেন যথাক্রমে বৎসরাজ ও নাগভট্ট এবং রাষ্ট্রকূট বংশের ধ্রুব ও তৃতীয় গোবিন্দ। ধর্মপাল বাংলাদেশ এবং বিহারের সীমান্তের বাইরে আধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়ে পশ্চিমদিকে এবং প্রতিহার নরপতি বৎসরাজ পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হলে তাঁহাদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে।

সম্ভবতঃ বৎসরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু এই সময় বৎসরাজ রাষ্ট্রকুট নরপতি ধ্রুবর নিকট পরাজিত হন। এরপর ধ্রুব গাঙ্গেয় উপত্যকায় অভিযান করে ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট নরপতি ধ্রুবর পক্ষে উত্তর ভারতে দীর্ঘকাল আধিপত্য করা সম্ভব হয় নি। ধর্মপাল কনৌজের নরপতি ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করে তার জায়গায় আশ্রিত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বৎসরাজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট প্রতিহার রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় নাগভট্ট পরে কনৌজ আক্রমণ করে চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় নাগভট্ট প্রতিহার রাজ্যের রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত করেছিলেন। চক্রায়ুধকে পরাজিত করে নাগভট্ট পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং মুঙ্গেরের নিকট এক যুদ্ধে ধর্মপালকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এই পরাজয়ের ফলে কনৌজ ধর্মপালের প্রভাব হইতে মুক্ত হয় এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ধর্মপালের আধিপত্য সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনঃ হিউয়েন সাঙের বিবরণ ও সমসাময়িক সাহিত্য থেকে পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

হিউয়েন সাঙ বাংলাদেশের অধিবাসীদের শ্রমসহিষ্ণু, সাহসী এবং অমায়িক বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলার জনগণ শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল ছিল। সেযুগে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বাংলাদেশেও নারীদের প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল না। পুরুষদের বহু বিবাহ এবং উচ্চবর্ণের নারীদের ক্ষেত্রে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিধবা-বিবাহ নিন্দনীয় ছিল।

বাংলাদেশ ছিল প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণই ছিল কৃষক। তন্তুবায়, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, তৈলকার প্রভৃতি কারিগরদের নিজস্ব সঙ্ঘ ছিল।

ভাত, মাছ, মাংস, তরি-তরকারি, ঘি, দুধ ছিল বাঙালীর প্রধান

খাদ্য। বাংলাদেশে গুড় ও চিনি তৈরি হতো। সেযুগের পুরুষেরা হাঁটু পর্যন্ত ধুতি এবং নারীরা গোড়ালী পর্যন্ত শাড়ী পরত। নারী-পুরুষ উভয়ই অলংকারপ্রিয় ছিল। কেবলমাত্র সম্পদশালী ব্যক্তিগণই মণি-মুক্তা এবং মূল্যবান স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার ব্যবহার করত। বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে নানা প্রকার ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদের প্রচলন ছিল। সংগীত, নৃত্য এবং অভিনয় বাঙালীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। যানবাহনের মধ্যে প্রধান ছিল গো-শকট ও নৌকা। সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি হস্তী, অশ্ব, রথ ও পালকি ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। কৃষিকর্ম বাঙালীর প্রধান উপজীবিকা হলেও সেকালে বাঙালী শিল্পে ও বাণিজ্যে খুবই পারদর্শী ছিল। বাংলার সূক্ষ্মবস্ত্র দেশ বিদেশে চালান যেত। পাল ও সেন যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রগণ্য ছিল। তাম্রলিপ্ত এবং সপ্তগ্রাম ছিল বাংলার বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর।

প্রাচীন বাংলার শিক্ষা, ধর্ম ও শিল্পচর্চা : সাহিত্যের ক্ষেত্রে পালযুগের বিশিষ্ট অবদান আছে। এই যুগের তাম্রশাসনে বৈদিক সাহিত্য, মীমাংসা, ব্যাকরণ, তর্ক প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে বহু ব্যক্তির পাণ্ডিত্যের উল্লেখ আছে। উচ্চ রাজকর্মচারীদের মধ্যে দেবপালের মন্ত্রিদ্বয়, দর্ভপাণি, কেদার মিশ্র এবং ভবদেব ভট্ট বিদ্বান ছিলেন। সেনযুগে সংস্কৃতের ব্যাপক চর্চা হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বাংলার সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ। সেন নরপতিদ্বয় বল্লালসেন ও লক্ষ্মণ সেন বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বল্লালসেন প্রণীত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর সময়ে কবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। জয়দেব ভারতবর্ষে সর্বত্র সমাদৃত "গীতগোবিন্দম্" কাব্যের রচয়িতা। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পালযুগেই পাওয়া যায়। পালযুগের নরপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। নালন্দা মহাবিহারের উন্নতি পাল নরপতিদের অকুণ্ঠ দানেই সাধিত হয়েছিল। ওদন্তপুরী, সোমপুর এবং বিক্রমশীলা মহাবিহার পালযুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ গোপাল ওদন্তপুরী মহাবিহারের এবং ধর্মপাল বিক্রমশীলা মহাবিহারের

প্রতিষ্ঠাতা। বিখ্যাত আচার্য অতীশ দীপঙ্কর পালরাজ মহীপালের আহ্বানে বিক্রমশীলার প্রধান আচার্যপদ গ্রহণ করেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের এক স্বতন্ত্র রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। বুদ্ধ পূজায় হিন্দু দেব-দেবীর অর্চনায় অঙ্গীভূত মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন হয়েছিল। সেন নরপতিগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেন বংশের শাসনকালে পৌরাণিক ধর্মের শক্তিবৃদ্ধির ফলে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে ক্রমশঃ গ্রাস করে ফেলে এবং বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম দ্রুত বিলুপ্ত হয়।

পাল যুগের বিখ্যাত শিল্পীদ্বয় **ধীমান** ও **বীতপাল** প্রস্তর ও ধাতুমূর্তি নির্মাণে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। সেন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন **শূলপাণি**।

দক্ষিণ ভারত

নর্মদা নদীর দক্ষিণাঞ্চল 'দক্ষিণাপথ' বা দাক্ষিণাত্য নামে পরিচিত। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত তামিল অঞ্চলটিকে কেউ কেউ 'সুদূর দক্ষিণ' নামে অভিহিত করে থাকেন। বিন্ধ্য পর্বতমালা আর্যাবর্তকে দক্ষিণাপথ হইতে পৃথক করেছে। প্রাচীনকালে বৈদেশিক আক্রমণসমূহ উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল; দক্ষিণ ভারত এই সকল রাজনৈতিক গোলযোগ হতে মুক্ত ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর দাক্ষিণাত্যে চেত ও **সাতবাহন** রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের পর দাক্ষিণাত্যে বহু স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠে। এদের মধ্যে বাতাপি বা বাদামীর **চালুক্যবংশ**, কাঞ্চীর পল্লব বংশ এবং **তাঞ্জোরের চোল** বংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যগুলির মধ্যে পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষ সত্ত্বেও এরা স্বকীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলবার অবকাশ পেয়েছিল।

বাদামীর চালুক্য বংশঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে একটি শক্তিশালী রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে। এই বংশ চালুক্য বংশ নামে প্রসিদ্ধ। বাতাপি বা বাদামী নগরকে কেন্দ্র করে চালুক্য শক্তি গড়ে উঠেছিল। কিংবদন্তী আছে যে, চালুক্যগণ

মনু অথবা চন্দ্র বংশ হইতে উদ্ভূত এবং প্রাচীনকালে চালুক্য বংশীয় রাজগণ অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জয়সিংহ এবং তার পুত্র রণরাগের নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যের বাদামী বা বাতাপি অঞ্চলে একটি নতুন চালুক্য রাজ্য গড়ে উঠে। রণরাগের পুত্র প্রথম পুলকেশী ছিলেন প্রকৃতপক্ষে প্রথম স্বাধীন চালুক্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম পুলকেশীর পরে তাঁর দুই পুত্র কীর্তিবর্মন এবং মঙ্গলেশ পর পর রাজত্ব করেন। কীর্তিবর্মন পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। কীর্তিবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি একে একে বনবাসীর কদম্বরাজ, মহীশূরের গঙ্গরাজ ও কোঙ্কনের মৌর্যরাজকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। একটি নৌ-অভিযান প্রেরণ করে তিনি বোম্বাই-এর অনতিদূরে পুরী বা এলিফ্যান্ট-দ্বীপটিও অধিকার করে নিয়েছিলেন। এই সময়ে উত্তর ভারতের পরাক্রান্ত সম্রাট হর্ষবর্ধন এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলে দ্বিতীয় পুলকেশী নর্মদা নদীর নিকটবর্তী কোনও স্থানে তাঁকে পরাজিত করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রভাব-প্রতিপত্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরাজ নরসিংহবর্মন তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লব-শক্তিকে পরাভূত করে চালুক্য সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত করেন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিনয়াদিত্য পল্লব, চোল, পাণ্ড্য, কেবল প্রভৃতি রাজাদিগকে পরাজিত করে রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। বিনয়াদিত্যের পুত্র বিজয়াদিত্যের রাজত্বকাল (৬৯৮-৭৩৩) মোটামুটি শান্তিতে অতিবাহিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল চালুক্য ও পল্লবদের মধ্যে সংঘর্ষে অতিবাহিত করতে হয়েছিল এবং চালুক্যরাজ কাঞ্চী অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পরে তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনের রাজত্বকালে ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূট রাজ দন্তিদুর্গের অভ্যুত্থানের ফলে বাদামীর চালুক্য শক্তি বিনষ্ট হয়।

বাদামীর চালুক্যগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনুসরণ করতেন এবং অনেকে

বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। তাঁরা সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে রাজ্য সুশোভিত করেছিলেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও চালুক্য রাজগণ সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই সময় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল ; কিন্তু জৈনধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। চালুক্যরাজগণ শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অজন্তার কয়েকটি গুহার প্রাচীর-চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল এবং সুবিখ্যাত এলিফ্যাণ্টার গুহামন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল।

কাঞ্চীর পল্লব বংশ: খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে কাঞ্চীতে পল্লব রাজবংশ স্থাপিত হয়। ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে সিংহবিষ্ণু নামক একজন পরাক্রান্ত রাজা কাঞ্চীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। সপ্তম শতকের প্রথমে সিংহবিষ্ণুর পুত্র **প্রথম মহেন্দ্রবর্মন** (আঃ ৬০০—৬৩০) সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহেন্দ্রবর্মন শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে ত্রিচিনাপল্লীতে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তিনি নিজেও সুপণ্ডিত ছিলেন। বিলাস-প্রহসন নাট্যের রচয়িতা হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র **প্রথম নরসিংহবর্মন** (আঃ ৬৩০—৬৬৮) ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁর সঙ্গে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হয়েছিল এবং প্রতি যুদ্ধেই তিনি পুলকেশীকে পরাজিত করেছিলেন। প্রথম নরসিংহবর্মন স্থাপত্যশিল্পের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময়ে মহাবল্লী-পুরমের রথমন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরসমূহ পাহাড় কেটে নির্মাণ করা হয়েছিল। পল্লব স্থাপত্যের ইহা এক অপরূপ কীতি। নরসিংহবর্মনের উত্তরাধিকারীদ্বয়
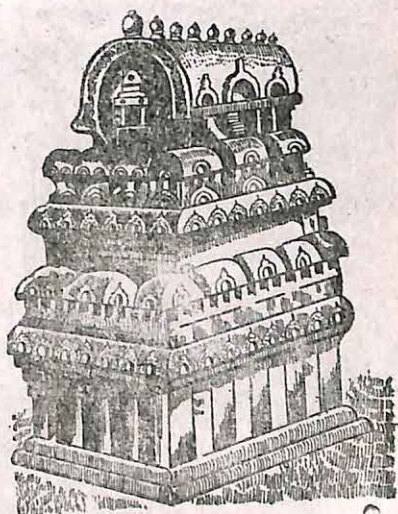
মহাবল্লীপুরমের রথ

দ্বিতীয় **মহেন্দ্রবর্মন** এবং প্রথম **পরমেশ্বরবর্মনকে** চালুক্য রাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য পরাজিত করে কাঞ্চী অধিকার করেন। প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় **নরসিংহবর্মন** রাজসিংহাসন লাভ করেন। দ্বিতীয় নরসিংহবর্মনের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন আনুমানিক ৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণ একত্র হয়ে রাজার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় দ্বাদশ বর্ষীয় একজন বালক আত্মীয়কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। নতুন রাজা দ্বিতীয় **নন্দীবর্মন পল্লবমল্ল** নাম ধারণ করে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। নন্দীবর্মনের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারিগণের রাজত্বকালে পাণ্ড্য ও রাষ্ট্রকূটগণের অবিরাম আক্রমণে পল্লব শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে পল্লব বংশের শেষ রাজা **অপরাজিতকে** পরাজিত করে চোল রাজা আদিত্য পল্লব রাজ্য ধ্বংস করেছিলেন (আঃ ৮৯১ খ্রীঃ)।

পল্লববংশীয় রাজারা সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে কাঞ্চী শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি প্রসিদ্ধ
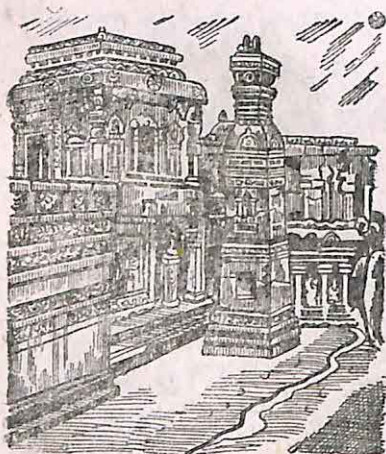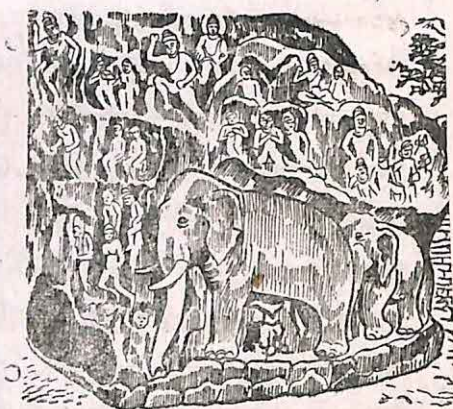
কৈলাসনাথের মন্দির মামল্লপুরমের রথমন্দির

কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। পল্লব রাজগণ প্রস্তরনির্মিত বহু কারুকার্যময় মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দির এবং মামল্লপুরম রথমন্দিরগুলি পল্লব স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ

নিদর্শন। এক একটি পাহাড় খোদাই করে এই অত্যাশ্চর্য মন্দিরগুলি নির্মাণ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে দাক্ষিণাত্যের মন্দির নির্মাণে কাঠ ব্যবহার করা হতো। এই সময় মন্দিরাদি নির্মাণে প্রথম প্রস্তর ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল। পল্লব-শিল্প ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিল।

চোল-রাজ বংশ ও তাঁদের সামুদ্রিক তৎপরতা : চোলেরা অতি প্রাচীন জাতি। অশোকের অনুশাসনে চোলদের উল্লেখ আছে। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে কারিকালের নেতৃত্বে চোলগণ একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। পরবর্তীকালে পল্লব জাতির আক্রমণে কারিকাল প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজয়ালয়ের নেতৃত্বে চোলবংশের পুনরভ্যুদয় ঘটে। বিজয়ালয় পল্লবদের অধীনে একজন শক্তিশালী সামন্ত ছিলেন। পল্লব ও পাণ্ড্যদিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহের সুযোগ নিয়ে তিনি পাণ্ড্য রাজ্যের অন্তর্গত তাঞ্জোর অধিকার করে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তাঞ্জোরে এই নবগঠিত রাজ্যের রাজধানী হলো। তাঁর পুত্র প্রথম আদিত্য পল্লবরাজ অপরাজিতকে পরাভূত ও নিহত করে পল্লবশক্তি ধ্বংস করেন। দশম শতাব্দার মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণ আদিত্যের পুত্র পরান্তককে পরাজিত করলে চোলরাজ্য হীনবল হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজ প্রথম রাজরাজের রাজত্বকালে চোলশক্তি পুনরায় প্রবল হয়ে উঠে। রাজরাজ একে একে মহীশূরের গঙ্গ, পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য জয় করে সমুদ্র অতিক্রম করে সিংহল আক্রমণ করেন। রাজরাজের পুত্র প্রথম রাজেন্দ্রচোল তাঁর শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর সাহায্যে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করেন। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের একাংশ, মালয়, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ জয় করে প্রথম রাজেন্দ্রচোল অবিস্মরণীয় কীর্তি অর্জন করেন। প্রথম রাজেন্দ্রচোলের মৃত্যুর পর রাজাধিরাজ

রাজরাজ চোলের মুদ্রা

॥ ১২ ॥ ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের যোগাযোগ

অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে ব্যাবিলন এবং মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপ ও উপদ্বীপে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করেছিল। ঐ যুগে জল ও স্থলপথে আরব, মিশর, রোম, মধ্য এশিয়া, চীন, মালয় প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারত জল ও স্থলপথে বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করেছিল। মধ্য-এশিয়ার যে-সকল স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল তাদের সম্মিলিতভাবে বৃহত্তর ভারত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। একদিকে গান্ধার, কপিশা, খোটান, কাশগড় এবং অপরদিকে মালয়, কম্বোডিয়া, আনাম (চম্পা), সুমাত্রা (সুবর্ণ দ্বীপ), জাভা (যবদ্বীপ), বোর্ণিও ও চীনে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মধ্য এশিয়া ঃ অতি প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। মানচিত্রে **পূর্ব-তুর্কীস্তান** বলে যে অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয় তারই অপর নাম মধ্য এশিয়া। বর্তমানে ঐ অঞ্চল মরুময়। এই মরুভূমির উত্তর ও দক্ষিণ সীমানায় **খোটান, কাশগড়, ইয়ারকন্দ, কুচা, কারাশর, তুর্কান** প্রভৃতি স্থানগুলি মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল।

অরেলস্টাইন প্রমুখ পণ্ডিতগণ বালুকাস্তূপ খুঁড়ে খোটান, কাশগড়, সমরকন্দ প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় সংস্কৃতির ধর্ম ও সস্কৃতির বহু নিদর্শন পেয়েছেন। এই সকল স্থানে বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ, বহু স্তূপ, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। এই অঞ্চলে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত শহরের

ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে বিচরণ করবার সময় অরেলষ্টাইন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সময় তাঁর মনে হতো তিনি কোনও প্রাচীন ভারতীয় নগরীর মধ্যে অবস্থান করছেন।

অতি প্রাচীনকালেই মধ্য এশিয়ার সাথে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। কুষাণ নরপতিগণের আদিম নিবাস ছিল মধ্য এশিয়ায়। তাঁরা মধ্য এশিয়ায় রাজনৈতিক প্রাধান্যও বিস্তার করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে দ্রুত প্রসার লাভ করে। কুষাণ যুগে মধ্য-এশিয়ার খোটান, কুচা তুর্কান, কাশগড় প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ এবং ভারতীয় সভ্যতার কয়েকটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। মধ্য এশিয়ার স্থলপথে ভারতে আগমন এবং ভারত হতে প্রত্যাবর্তন কালে এই অঞ্চলে হিউয়েন সাঙ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন। ফা-হিয়ানও খোটানে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের কথা উল্লেখ করেছেন।

খোটানে প্রাপ্ত বুদ্ধ মূর্তির ধ্বংসাবশেষ

ভারত ও চীন ঃ চীনের সঙ্গে ভারতের পরিচয় প্রথমে বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে হলেও কালক্রমে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে এই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম প্রথম চীনে প্রচারিত হয়েছিল। হান্ বংশীয় সম্রাট সিং-তির রাজত্বকালে তাঁর অনুরোধক্রমে ভারত হতে ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ নামক দুইজন বৌদ্ধ ভিক্ষু বহু শাস্ত্রগ্রন্থসহ চীনে যান। সেখানে তাঁরা অবস্থান করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এবং বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ চীনা ভাষার অনুবাদ করে জীবন অতিবাহিত করেন। রাজ পৃষ্ঠ-পোষকতার ফলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে চীনে প্রসার লাভ করে। ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ ব্যতীত ভারত এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হতেও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ দলে দলে চীনে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করলেন। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম প্রায় সমস্ত

চীনে বিস্তার লাভ করে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু মঠ ও সংঘারাম নির্মিত হয়। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতায় সংস্কৃতিও চীনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার পরে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ভারত হতে দলে দলে বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চীন ধরে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের পথে গিয়েছিলেন। চীন হতেও বহু শিক্ষার্থী এবং ভিক্ষু বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ ও তীর্থ পর্যটনের উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ঃ অতীশ দীপঙ্কর ঃ কথিত আছে যে, ভারতীয় জনৈক রাজপুত্র তিব্বতে এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক স্রং-সান-গাম্পো। গাম্পো অত্যন্ত পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকাল হতেই তিব্বতে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় লিপির চর্চা আরম্ভ হয়েছিল। বহু তিব্বতী পণ্ডিত ভারতে আগমন করে নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করেন। বাংলার পাল রাজ্যের সঙ্গে তিব্বতের সৌহার্দমূলক সম্পর্ক ছিল। বাংলার সুসন্তান অতীশ দীপঙ্কর তিব্বত-রাজের আমন্ত্রণে সে দেশে গিয়েছিলেন। তিনি তের বছর তিব্বতে থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তিনি শেষ জীবন ধর্মগ্রন্থ রচনা এবং অবস্থান ধর্মপ্রচারে অতিবাহিত করেছিলেন। অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতেই দেহরক্ষা করেছিলেন। অতীশ ছিলেন বাঙালী। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয়েছিল শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর।

অতীশ দীপঙ্কর

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা, বালি, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এবং আনাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশগুলি প্রাচীনকালে ‘সুবর্ণভুমি’ নামে

পরিচত ছিল। সুবর্ণভূমিতে ক্রমশঃ ভারতীয় উপনিবেশসমূহ গড়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় হতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন রাজ্য স্থাপিত হয়। সুবর্ণভূমিতে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বহু সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের পরিবর্তন হলেও প্রায় এক হাজার বছরের অধিককাল স্থায়ী ভারতীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন এখানে রহিয়াছে।

যবদ্বীপ (জাভা) ঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ভৌগোলিক টমেলি যবদ্বীপের কথা উল্লেখ করেছেন। ঐ সময়েই যবদ্বীপে ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। দেববর্মন নামক যবদ্বীপের জনৈক রাজা ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা যষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিম জাভায় শক্তিশালী হিন্দু রাজ্য ছিল। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্য জাভায় আর একটি রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের প্রসারের ফলে বা প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয়ের ফলে এই রাজ্যের পতন হয়। দশম শতাব্দীতে পূর্ব-জাভাতে আর একটি রাজ্যের অভ্যুদয় হয়, কিন্তু এই রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিজয় নামে একজন রাজা এখানে একটি নতুন রাজবংশ স্থাপন করেন। সমাজপহিত এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে মাজাপর্বতে সাম্রাজ্য মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাভাতে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

কম্বোজ (কম্বোডিয়া) ঃ কম্বোডিয়া রাজ্যের ভারতীয় নাম ছিল কম্বোজ। চৈনিকগণ এই অঞ্চলকে 'ফু-নান' বলত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই হিন্দু রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিংবদন্তী অনুসারে 'কৌণ্ডিন্য' নামক এক ব্রাহ্মণ সমুদ্রপথে এই দেশে আগমন করেন। তিনি স্থানীয় রাজকুমারী সোমাকে বিয়ে করে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কম্বোজ রাজ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার হয়েছিল। এই অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষার চর্চা হতো।

কম্বোজ রাজ্যের নরপতিগণের মধ্যে দ্বিতীয় জয়বর্মন, যশোবর্মন, দ্বিতীয় সূর্যবর্মন, সপ্তম জয়বর্মন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জয়বর্মনের

রাজত্বকালে বর্তমান অঙ্কোরথোমে কম্বোজের রাজধানী স্থাপিত হয়। ঐ সময় নগরটি যশোধরপুর নামে পরিচিত ছিল। নগরটি সুন্দর
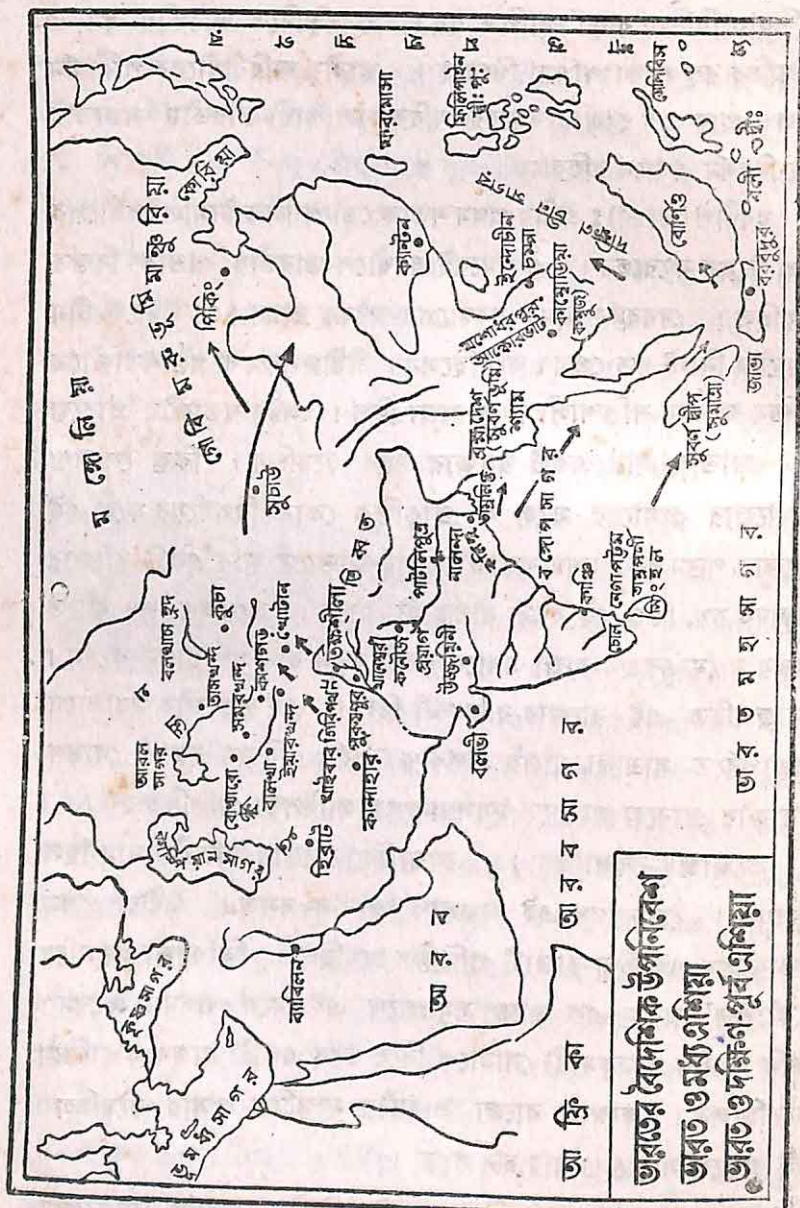
পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছিল। নগরটিতে কয়েকটি প্রশস্ত রাজপথ ও একটি প্রাচীরবেষ্টিত জলাশয় ছিল। এই নগরে পাঁচটি

প্রবেশ তোরণ ছিল। নগরের মধ্যস্থলে একটি বিরাট মন্দিরে সম্ভবতঃ শিবপূজা হতো। দুই মাইল দীর্ঘ ও দুই মাইল প্রস্থ এই নগরটির লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষ। দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা সূর্যবর্মন

আঙ্কোরভাট
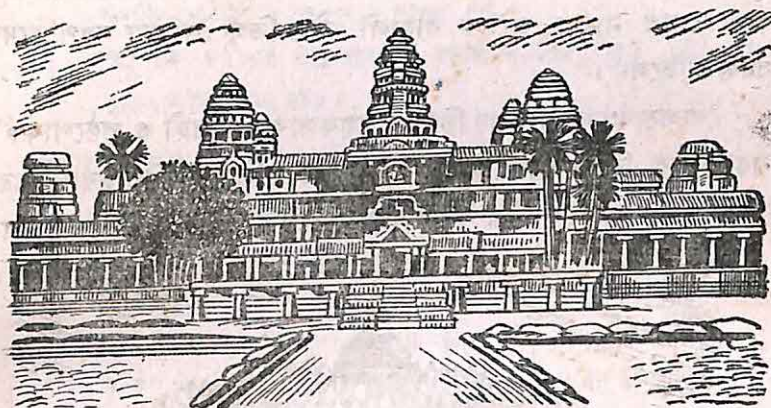
আঙ্কোরভাট নামক ২১৩ ফুট উচ্চ একটি বিশাল বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করেন। এর মাথায় চল্লিশটি চূড়া ছিল। এই মন্দিরটি কম্বোজে হিন্দু শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সহস্রাধিক ভারতীয় ব্রাহ্মণ কম্বোজে বসতি স্থাপন করে অহোরাত্র শাস্ত্র চর্চায় অতিবাহিত করতেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শৈলেন্দ্র বংশ : খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশের শাসনাধীনে একটি পরাক্রমশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিল। চীন ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে শৈলেন্দ্র নরপতিদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। আরব বণিকগণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র রাজ্যকে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালীরূপে বর্ণনা করেছেন। শৈলেন্দ্র-বংশীয় নরপতিগণ "মহারাজা" উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের বিশাল নৌ-বাহিনী ছিল। চম্পা ও কম্বোজের বিরুদ্ধে এই বংশের নরপতিগণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। নবম শতাব্দীর এক আরব গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শৈলেন্দ্রবংশীয় নরপতিদের প্রতিদিন রাজস্ব ছিল দুই শত মণ সোনা। শৈলেন্দ্র রাজারা মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। বাংলাদেশেও ঐ সময় পাল রাজাদের শাসনকালে

মহাযান মতবাদের প্রাধান্য ছিল। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব নালন্দায় মঠ নির্মাণ করবার অনুমতি প্রার্থনা করে ঐ মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচখানা গ্রাম চেয়ে দেবপালের নিকট দূত প্রেরণ করেছিলেন। কুমারঘোষ নামক জনৈক বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু শৈলেন্দ্র নরপতিদের ধর্মগুরু ছিলেন।

শৈলেন্দ্রবংশের রাজগণ ছিলেন শিল্পকলার গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষক। বরবুদুরের বিশ্ববিখ্যাত স্তূপ শৈলেন্দ্র নরপতিদের শিল্পানুরাগ এবং অতুলনীয় স্থাপত্যকীর্তির সাক্ষ্য বহন করছে। একটি পাহাড়ের উপর
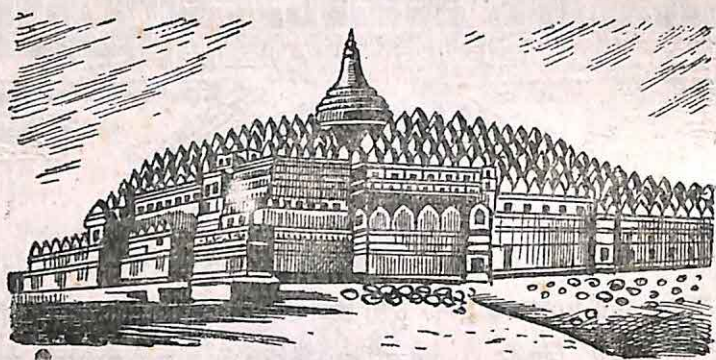
বরবুদুর

নির্মিত মন্দিরটির দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি এবং রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত অনেক দৃশ্য ভারতীয় স্থাপত্যের অপূর্ব মহিমা ঘোষণা করছে। একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের এবং পরবর্তীকালে পাণ্ড্য রাজগণের আক্রমণে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

॥ অনুশীলনী ॥

সংক্ষিপ্ত উত্তরীভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। মধ্য এশিয়ার ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রগুলির নাম কর। এইসব অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার কি কি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে ?

২। চীনে কি ভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছিল ?

৩। তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। সুবর্ণভূমি বলতে কোন্ অঞ্চলকে বুঝায়? এখানে প্রাচীন ভারতীয় উপনিবেশ গঠনের কি প্রমাণ পাওয়া যায়?

৫। কম্বোজ রাজ্যের উল্লেখযোগ্য রাজাদের নাম কর। এই রাজ্যের রাজধানীর বর্ণনা দাও।

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের যোগাযোগ কি ভাবে গড়ে উঠেছিল? এই যোগাযোগের পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল?

৩। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় শৈলেন্দ্রবংশের উত্থান-পতনের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কি ভাবে এবং কোন্ কোন্ স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল?

সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

১। পূর্বতুর্কীস্থান, ২। কাশগড়, ৩। ইয়ারকন্দ, ৪। যবদ্বীপ, ৫। কম্বোজ।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। বৃহত্তর ভারত বলতে কি বোঝ?

২। চীনে বৌদ্ধধর্ম কখন প্রচারিত হয়েছিল?

৩। স্রং-সান-গাম্পো কে ছিলেন?

৪। অতীশ দীপঙ্কর কেন তিব্বতে গিয়েছিলেন?

৫। আঙ্কোরভাট মন্দির কে নির্মাণ করেছিলেন?

৬। বরবুদুর স্তূপটি কোন্ রাজাদের আনুকূল্যে তৈরি হয়েছিল?

———

॥ ১৩ ॥ দিল্লী-সুলতানীর ইতিহাস
(১২০৬—১৫২৬ খ্রীঃ)

ভারতে তুর্ক-আফগানদের আগমন : দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে প্রথম তিনটি বংশ, যথা—দাসবংশ, খলজী বংশ এবং তুঘলক বংশ ছিল তুর্কী, চতুর্থ বংশীয় সৈয়দ বংশের সুলতানগণের আদি নিবাস ছিল আরবে এবং পঞ্চম বংশীয় লোদী সুলতানগণ আফগানিস্তান থেকে ভারতে এসেছিলেন।

৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে গজনী অঞ্চলে আলপ্তগীন নামক জনৈক তুর্কী একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আলপ্তগীনের জামাতা সবুক্তগীন গজনীর শাসক হন। ৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতের শাহী বংশীয় নরপতি জয়পালকে পরাজিত করে শাহী রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করেন। ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মাহ্‌মুদ গজনীর সুলতান হলেন। ১০০০ হতে ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাহ্‌মুদ মোট সতের বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এদেশের ধনদৌলত লুণ্ঠন করেন। সুলতান মাহ্‌মুদের ভারত আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এদেশের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনই যে তাঁর ভারত অভিযানসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সুলতান মাহ্‌মুদ পাঞ্জাবকে গজনী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেও ভারতের অন্যত্র কোথাও তাঁর আধিপত্য স্বীকৃত হয়নি।

মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পর পারস্যের পূর্বাঞ্চলে ঘুর বংশীয় আলাউদ্দীন ইয়ামণি গজনীর সুলতান বংশের উচ্ছেদ সাধন করে সেখানে রাজ্য স্থাপন করেন। গজনীতে ঘুর বংশীয় গিয়াসউদ্দীনের রাজত্বকালে তাঁহার ভ্রাতা মৈজুদ্দীন ভারতের হিন্দুরাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। এই মৈজুদ্দীনই ভারতের ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নামে বিখ্যাত। ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘুরী মূলতান জয় করেন। ১১৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে চৌহান নরপতি পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘুরীকে পরাজিত করেন। কিন্তু ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী এক বিপুল

বাহিনী লইয়া পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করেন এবং তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হলেন। দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি অঞ্চল মহম্মদ ঘুরীর অধিকারভুক্ত হলো। এর পর চন্দাবারের যুদ্ধে কনৌজের রাজা জয়চাঁদ পরাজিত হলে গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে তুর্কী আধিপত্যের পথ প্রশস্ত হলো। কুতুবউদ্দীন আইবক ও ইখতিয়ার উদ্দীন মহম্মদ বক্তিয়ার নামে ঘুরীর দুই অনুচর উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হয়। মহম্মদ ঘুরীই ছিলেন ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে মহমম্মদ ঘুরী পাঞ্জাব হতে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল অঞ্চলের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আলাউদ্দীন

মহম্মদ ঘুরী নিঃসন্তান ছিলেন। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ক্রীতদাস ও অনুচর কুতুবউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুতুবউদ্দীন দাস রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে জালালউদ্দীন ফিরুজ নামক জনৈক আমীর শেষ দাস সুলতান কায়ুরমাসকে হত্যা করে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। জালালউদ্দীন ফিরুজ খলজী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। খলজী বংশীয় আলাউদ্দীনের শাসনকালে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য সর্বাধিক সম্প্রসারিত হইয়াছিল। কেবলমাত্র উত্তর ভারতেই নয়, দাক্ষিণাত্যেও মুসলিম সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল। খলজী বংশ ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লী সুলতানী শাসন করেছিলেন। ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজী মালিক

মহম্মদ তুঘলক

'তুঘলক বংশ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ১৪১৪ হইতে ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দ—এই সাইত্রিশ বৎসর কাল দিল্লীতে দুর্বল সৈয়দ বংশ শাসন করেছিল। আফগান জাতীয় লোদী বংশোদ্ভব বাহলুলের হস্তে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করে শেষ সৈয়দ সুলতান আলাউদ্দীন আলম শাহ বদায়ুনে চলে যান। লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাহলুল শক্তিশালী ছিলেন। এই বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) পরাজিত করে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক প্রভাব: ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। বহু মুসলমান এদেশে এসে বসবাস করতে থাকে এবং নানা কারণে অসংখ্য ভারতবাসীও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ইসলামের একেশ্বরবাদ ও ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক রীতি-নীতিতে গণতান্ত্রিক ভাবধারার ফলে মুসলমানগণ স্বভাবতঃই নিজেদের হিন্দুদের নিকট থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল ভারতে একসঙ্গে বসবাস করবার ফলে পরবর্তীকালে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ দূরীভূত হয় এবং কালক্রমে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা তুর্ক-আফগান যুগের শেষভাগে পরিলক্ষিত হয়।

সুলতানী আমলে সমাজ-জীবন: মুসলমান সম্রাটগণ রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্রাটের পরেই সমাজে ছিলেন অভিজাতগণ। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আমীর-ওমরাহগণ, প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ। আধুনিক কালের ন্যায় মধ্যবিত্তশ্রেণী মুসলমান যুগে ছিল না; তবে চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, কেরাণী প্রভৃতিও মধ্যযুগে ছিল। সমাজের নিম্নস্তরে ছিল দেশের অগণিত নিঃস্ব কৃষক ও শ্রমজীবী। তুর্ক-আফগান যুগে অসংখ্য হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ফলে কতকগুলি হিন্দু আচার-ব্যবহার মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে। রাজকর্মচারীদের উৎপীড়নে প্রজা, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি দুরবস্থায় দিন কাটাত।

সমাজে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। শ্রমিক, ভৃত্য, দোকানদার প্রভৃতির জীবন ক্রীতদাস অপেক্ষা উন্নততর ছিলনা।
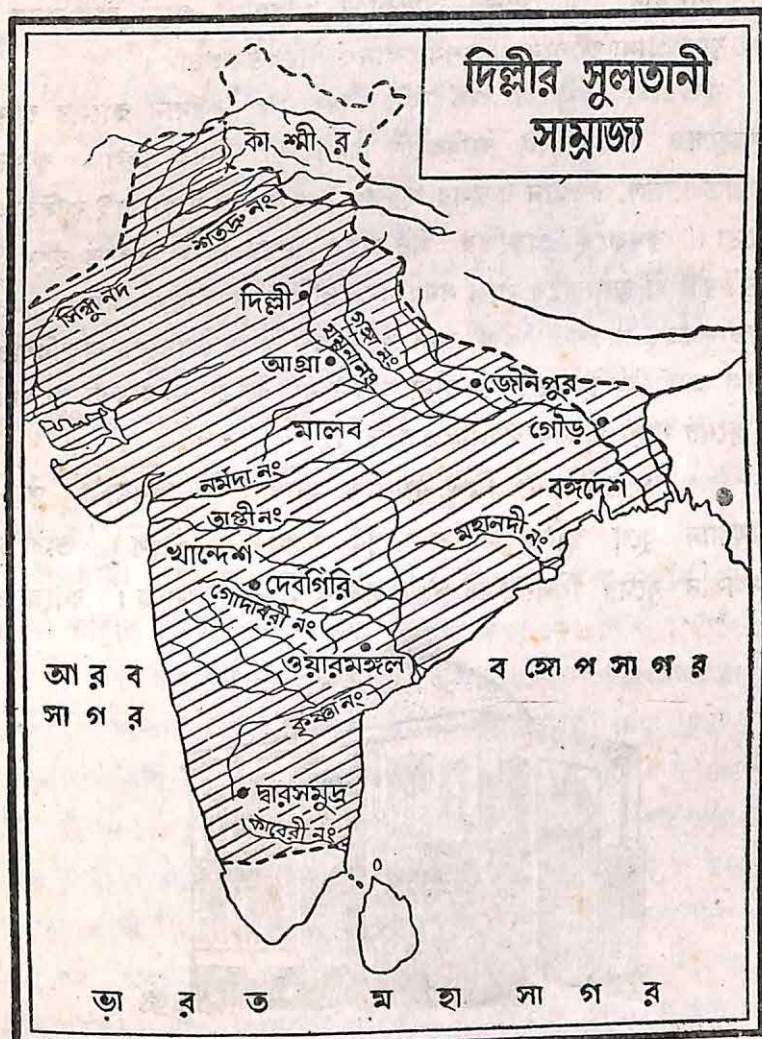
তুর্ক-আফগান যুগে হিন্দুসমাজকে ইসলামের প্রভাব হতে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে জাতিভেদ প্রথা কঠোরতর হলো। হিন্দুসমাজে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য ও পণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। পর্দা-প্রথা মুসলমান স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। ক্রমশঃ উচ্চ

শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা প্রবর্তিত হলো। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার কুসংস্কার প্রচলিত ছিল।

মুসলমান যুগে দেশের অধিকাংশ অধিবাসী গ্রামে বাস করত। এই যুগে গ্রাম্য জীবনের বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি।

সুলতানী আমলে অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ বর্তমান কালের ন্যায় মধ্যযুগেও কৃষিকার্যেই অধিকাংশ দেশবাসী নিযুক্ত ছিল। কৃষির পদ্ধতিও ছিল বর্তমান কালের অনুরূপ ; লাঙ্গলের সাহায্যেই কৃষিকার্য হতো। কৃষককে প্রকৃতির অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হতো। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ফলে সময় সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। যানবাহনের অভাব হেতু খাদ্যশস্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রেরণের অসুবিধার ফলে প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকত না, বহু লোকের মৃত্যু হতো। হিন্দুদের নানা প্রকার কর দিতে হতো।

শিল্প ও সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম ভাবধারায় সমন্বয় ঃ তুর্ক-আফগান যুগে স্থাপত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ হয়েছিল। ভারতে মুসলমান যুগের শিল্পরীতির স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কারোও

আলাই দরওজা
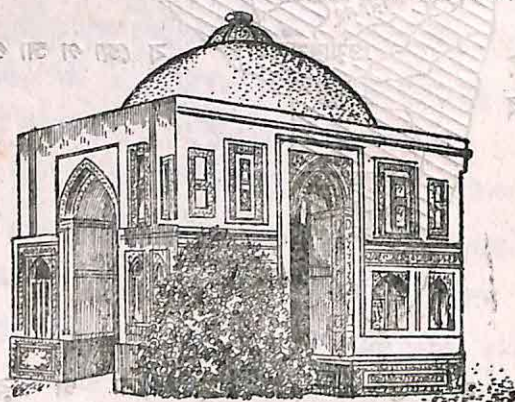
মতে এই শিল্পরীতি সম্পূর্ণরূপে ইসলামীয় ; কিন্তু হ্যাভেলের মতে হিন্দু-রীতি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে এই রীতির উদ্ভব হয়েছিল। যে পরিস্থিতিতে এই শিল্প-রীতি গড়ে উঠেছিল তাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় রীতির মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। হিন্দুধর্মে

পৌত্তলিকতার অস্তিত্ব ছিল ; ইসলাম ধর্মে তা নিষিদ্ধ ছিল। হিন্দু-ধর্ম সাজ-সজ্জার পক্ষপাতী হলেও ইসলাম ধর্মের উৎসবসমূহ অনাড়ম্বর ও শোভাহীন ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্থপতি একে অন্যের ভাবধারা গ্রহণ করেছিল। তুর্ক-আফগান যুগে নির্মিত স্থাপত্যের নিদর্শন সমূহের মধ্যে 'কুওয়াত-উল-ইসলাম' নামক মসজিদ, কুতুবমিনার নামক স্তম্ভ, আজমীরের 'আড়াই-দিনকা-ঝোঁপড়া', আলাউদ্দীন খলজীর 'আলাই-দরওজা' নামক তোরণ, তুঘলকাবাদ শহর, আদিনাবাদ দুর্গ, জাহান পানাহ শহর, ফিরোজাবাদ দুর্গ এবং হিসার ফিরোজা শহর উল্লেখযোগ্য।

কুতুবমিনার

সুলতানী আমলে ভাষা ও সাহিত্য ঃ তুর্ক-আফগান যুগে আরবী ভাষায় বহু ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ, ব্যাকরণ এবং কোরাণ ও হাদীশের ব্যাখ্যা রচিত হয়েছিল। এই যুগে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসী সাহিত্যের যথেষ্ট বিকাশ হয়েছিল। খলজী এবং তুঘলক বংশের সভাকবি আমীর খসরু ফারসী ভাষায় এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তুর্ক-আফগান যুগে রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হলেও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ অব্যাহত ছিল। এই যুগে উত্তর ভারতের কাশী, মিথিলা ও নবদ্বীপ সংস্কৃত চর্চার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। এই যুগের শেষভাগ হইতে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচারকগণ দুর্বোধ্য সংস্কৃতের পরিবর্তে সহজবোধ্য লৌকিক ভাষায় ধর্ম প্রচার করতে আরম্ভ করেন। এর ফলে হিন্দি, উর্দু এবং প্রাদেশিক ভাষাসমূহ বিকাশ লাভ করে। এই যুগ হতেই হিন্দি ভাষা প্রসার লাভ করতে থাকে। আমীর খসরু ও মালিক মহম্মদ জায়সী হিন্দি ভাষায় নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন। কবীরের দোহাগুলিও হিন্দী ভাষায় রচিত হয়েছিল।

ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভব ঃ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানগণ ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেছিলেন। ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ, সহজ সরল ধর্মাচরণ ও জাতিভেদমুক্ত সমাজজীবন, জাতিভেদে জর্জরিত হিন্দুদের সমাজজীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেজন্য সুলতানী আমলে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে ঐ ধর্ম গ্রহণ করে। এই ঘটনা সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজে চিন্তার কারণ হয়ে উঠে। ইসলামের সংস্পর্শের ফলে একদিকে যেমন হিন্দু-সমাজে রক্ষণশীলতার আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি অপরদিকে উদার মতাবলম্বী ধর্ম সংস্কারকগণ কর্তৃক 'ভক্তিবাদ' প্রচারের ফলে উদার ধর্মনীতিরও আবির্ভাব হয়েছিল।

মধ্যযুগে ভারতের ধর্ম সংস্কারকদের মধ্যে বাংলার শ্রীচৈতন্য, পাঞ্জাবের নানক ও বারাণসীর কবিরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্য ঃ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হতেই তিনি বিদ্যানুরাগী এবং ধর্ম-ভাবাপন্ন ছিলেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্য সংসার ধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থান পরিভ্রমণ করে প্রেম ও বৈরাগ্যের বাণী প্রচার করেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের নাম বৈষ্ণব ধর্ম। তাঁর মতে ভগবৎ প্রেমেই একমাত্র মুক্তির উপায়। জীবনের শেষ আঠার বছর পুরীতে অতিবাহিত করিয়া ঐ স্থানেই শ্রীচৈতন্য দেহ রক্ষা করেন। চৈতন্যদেব ছিলেন বাংলা-দেশে বৈষ্ণব ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি বারাণসী, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে স্বীয় ভক্তি-ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য

নানক ঃ নানক মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক। নানক শিখধর্মের প্রবর্তক। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর জেলার তালবন্দী

গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের যা কিছু মহান তার উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নানক জাতিভেদ মানতেন না এবং একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানসমূহেরও বিরোধী ছিলেন। ঈশ্বরের গুণকীর্তন, জীবের সেবা এবং দৈহিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করার উপদেশ তিনি দিতেন। নানকের উপদেশগুলি যে গ্রন্থে সংকলিত আছে তার নাম গ্রন্থ-সাহেব। তাঁর শিষ্যগণ শিখ নামে পরিচিত। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল।

কবীর ঃ কবীরের জন্মকাল ও জন্মকূল সম্বন্ধে মতভেদ আছে; তাঁর মৃত্যুকালও সঠিক নির্দ্ধারিত হয়নি। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি ছিলেন এক ব্রাহ্মণ বিধবার পরিত্যক্ত সন্তান। কবীর নিরু নামক জনৈক মুসলমান তন্তুবায়ের গৃহে পালিত হয়েছিলেন। তার মধ্যে হিন্দু ভক্তিবাদ ও মুসলিম সুফীবাদের সমন্বয় হয়েছিল। তিনি ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু বা মুসলমানের স্বতন্ত্র ধর্মানুষ্ঠানে তাঁর কোনও আস্থা ছিল না। তাঁর মতে হিন্দু ও মুসলমান একই মৃত্তিকায় নির্মিত দুইটি পাত্র বিশেষ। বহু মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের বহু হিন্দু তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সহজ হিন্দীতে তাঁর ধর্মমত দোহার আকারে রচনা করেন। কবীর ছিলেন ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা—রামানন্দের শিষ্য।

বাংলাদেশ

ইলিয়াস-শাহী ও হোসেন-শাহী যুগে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা ঃ শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের শাসনকালে বাংলাদেশে সাহিত্য ও শিল্পের, বিশেষতঃ স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ হইয়াছিল। ইলিয়াসের পুত্র সিকন্দারের শাসনকালে আদিনাতে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তী শাসক গিয়াসউদ্দীন আজমের সঙ্গে পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজ সিরাজীর পত্রালাপ

ছিল। তিনি চীন দেশের সঙ্গে দূত বিনিময় করেছিলেন। হুসেন-শাহী শাসকদের মধ্যে নুসরত শাহ সাহিত্য, স্থাপত্য ও শিল্পকলার উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এগুলি সৌন্দর্য ও বিশালত্বের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। 'বড় সোনা মসজিদ' ও 'কদম রসুল' তাঁর স্থাপত্যকীর্তি ঘোষণা করছে। ইলিয়াস-শাহী বংশ ও হুসেন শাহের শাসনকালে বাংলার সংস্কৃতি নানাভাবে বিকাশ লাভ করে।
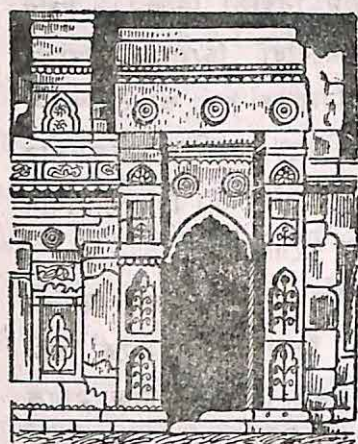
সোনা মসজিদ

এই সময় বীরভূমের কবি চণ্ডীদাস পদাবলী রচনা করেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল
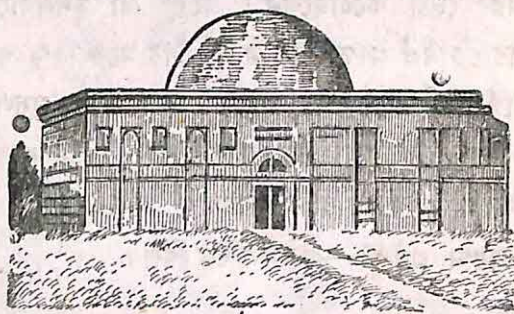
কদম রসুল

খাঁর উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন। শ্রীকরনন্দী অনুবাদ করেন মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব। মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য রচনা করে গুণরাজ খাঁ উপাধি পান। এছাড়া কবি কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' অনুবাদ, হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব ও রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র রচনার মধ্যে এই যুগের সংস্কৃত চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে এক ধর্মীয় আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবন-ই-বতুতা চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ পরিভ্রমণকালে প্রায় একশত পঞ্চাশ জন ফকির বাংলাদেশে দেখতে পেয়েছিলেন। এই সময় হিন্দু ও মুসলমানদের পারস্পরিক বিদ্বেষ প্রশমিত হ'লে ঐক্যবোধের সঞ্চার হয়। বৈষ্ণব ধর্ম বাংলাদেশে বিকাশ লাভ করে এবং চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের গতি অপ্রতিহত হইয়া উঠে। ভগবান কৃষ্ণের নাম বাংলাদেশের সর্বত্র উচ্চারিত হইতে থাকে এবং অগণিত নর-নারী প্রভুর ডাকে অনুপ্রাণিত হয়ে সামাজিক বৈষম্য ভুলে গিয়ে ভালবাসা ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে থাকে। বাংলাদেশের হুসেন শাহ উদ্ভাবিত 'সত্যপীর' নামক একটি নতুন ধর্ম বিশ্বাস হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। 'সত্য' কথাটি সংস্কৃত এবং 'পীর' কথাটি আরবী। বাংলা সাহিত্যের বহু কবিতায় ভগবান সত্যপীরের সম্মানে বহু কবিতা রচিত হয়েছে।

সুলতানী আমলে শাসন-ব্যবস্থা : তুর্ক-আফগান শাসনাধীনে ভারতবর্ষ একটি ইসলাম ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। কেন্দ্রীয়-শাসন তথা সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ছিলেন সুলতান স্বয়ং। সুলতান একাধারে ছিলেন সর্বোচ্চ শাসনকর্তা, সেনাপতি, আইন-প্রণেতা ও সর্বোচ্চ বিচারক। তিনি কোরাণের বিধিনিষেধ মেনে চলতেন। সামরিক শক্তি ছিল রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় পর্যায়েই সমর বিভাগের লোকদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হতো। মজলিস ই-খালওয়াৎ নামে এক সভা সুলতানকে শাসনকার্যে পরামর্শ দিত। 'ওয়াজির' বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজকর্মচারীদের মধ্যে প্রধান। রাজস্ব বিভাগ ছাড়া তিনি অপরাপর নানা বিভাগ দেখাশুনা করতেন। প্রধান হিসাবরক্ষককে বলা হতো মুশরিফ-ই-মুমালিক। আরিজ-ই-মুমালিক সামরিক বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। প্রত্যেক বিভাগের অধ্যক্ষ তাঁর কাজের জন্য একমাত্র সুলতানের কাছে দায়ী ছিলেন। রাজস্ব বিভাগের

অধিকাংশ কর্মচারীই ছিলেন হিন্দু। দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু ফিরুজ শাহ তুঘলক দণ্ড-বিধির কঠোরতা কতক পরিমাণে হ্রাস করেছিলেন।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সুলতানী সাম্রাজ্যকে কতকগুলি প্রদেশে এবং প্রদেশগুলিকে 'শিক' বা 'সরকারে' ভাগ করা হয়েছিল। কয়েকটি পরগণা নিয়ে এক-একটি সরকার গঠিত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নায়েব সুলতান নামে পরিচিত ছিলেন। ভূমি-রাজস্ব ছিল আয়ের প্রধান উৎস। উৎপন্ন ফসলের এক-পঞ্চমাংশ স্বাভাবিক রাজস্বের হার ছিল। আলাউদ্দীন খলজীর শাসনকালে তা বাড়িয়ে অর্ধাংশ করা হয়েছিল। হিন্দুদের জিজিয়া নামে বিশেষ কর দিতে হতো। সুলতানী সাম্রাজ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে দূরবর্তী প্রদেশের শাসনকর্তা মাত্রেরই স্বাধীন হওয়ার মনোবৃত্তি দেখা দিত।

॥ অনুশীলনী ॥

১। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। কবীর কে ছিলেন? তিনি কি ভাবে তাঁর ধর্মমত প্রচার করতেন?

২। নানকের একেশ্বরবাদ ধর্মমতের মূল কথা কি?

৩। চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্ম প্রচার সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

৪। মধ্যযুগে বাংলার সুলতানদের স্থাপত্য-শিল্পপ্রীতির কি পরিচয় পাওয়া যায়?

২। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। তুর্ক-আফগান যুগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বর্ণনা কর।

২। তুর্ক-আফগান যুগে হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর। তারা পরস্পরকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৩। তুর্ক-আফগান যুগে শিল্পে ও সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম ভাবধারার যে সমন্বয় হয়েছিল তার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৪। ভক্তিবাদ কাকে বলে? কয়েকজন ভক্তিবাদী নেতার আদর্শ ও উপদেশ বর্ণনা কর।

৫। নানক কে ছিলেন? তাঁর ধর্মীয় মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহ কে ছিলেন? তাঁদের আমলে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণ দাও।

৭। তুর্ক-আফগান সুলতানদের আমলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা কেমন ছিল?

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখঃ (ক) কবীর, (খ) গ্রন্থসাহেব।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। সুলতান মাহমুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেন?

২। মহম্মদ ঘুরী কে ছিলেন?

৩। ভারতে দাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

৪। ভারতে তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্যের অবসান কি ভাবে হয়?

৫। কবীর কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

৬। গ্রন্থসাহেব কি?

৭। নানক কোন্ ধর্মমত প্রচার করেছিলেন?

কনস্টান্টিনোপলের পতন : পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বর্বর জাতির আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল, কিন্তু বাইজানটাইন বা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে শিল্প সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং বিভিন্ন জ্ঞানচর্চার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল কনস্টান্টিনোপল। ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের পর আরব ও তুর্কী জাতিগুলি ধর্ম প্রচারের অন্তরালে যখন একের পর এক দেশ জয় করেছিল, বাইজানটাইন সাম্রাজ্য তখনও স্ব-মহিমায় অধিষ্ঠিত ছিল। একাদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণের ফলে বিপন্ন সম্রাট আলেক্সিয়াসের আবেদনক্রমে পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টান জাতিগুলি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করে। তাদের মিলিত চেষ্টায় বাইজানটাইন সাম্রাজ্য আপাতত রক্ষা পায়। কিন্তু ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা বিশাল বাহিনীসহ একই সঙ্গে জল ও স্থলপথে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করল। বাইজানটাইন সম্রাট ষষ্ঠ কনস্টানটাইন এই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী ব্যাপক লুণ্ঠন চালিয়ে কনস্টান্টিনোপল শহরটি ধ্বংস করল। রোমান তথা ইউরোপীয় সভ্যতার সর্বশেষ নিদর্শনটি এই ভাবে বিধর্মীদের আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের উপর কনস্টান্টিনোপলের পতনের প্রভাব : ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কনস্টান্টিনোপলের পতনের প্রভাব অপরিসীম। একাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকায় নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং শহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কালক্রমে বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। খ্যাতনামা মনীষিগণ ঐসব বিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চা শুরু করেন। ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক

চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিকরা এর নাম দিয়েছেন রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে জানার আগ্রহ, প্রাচীন সংস্কৃতিকে নতুন ভাবে মূল্যায়ণ, যুক্তি-তর্কের দ্বারা যা কিছু ভালো তা গ্রহণ করা, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানের প্রসারকেই বলা হয় নবজাগরণ। অপরপক্ষে বলা যায়, মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তিলাভের চেষ্টাই হলো রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কার ও পাঠের মধ্য দিয়ে পুরানো জ্ঞান-সাধনার ধারাটিকে বাঁচিয়ে তোলাই ছিল নবজাগরণের প্রথম কাজ। মঠের সন্ন্যাসীরা অনেক আগে থেকেই গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লেখা প্রাচীন পুঁথিগুলির নকল ও সংরক্ষণের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন।

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হয়ে উঠলে সেখানকার জ্ঞানীগুণী মনীষীরা ইতালিতে আশ্রয় নিলেন। তাঁরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বহু দুষ্প্রাপ্য বই। এর পূর্বে ইতালিতে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, কনস্টান্টিনোপলের মনীষীরা তাতে যোগ দিয়ে নবজাগরণের গতিকে আরও গতিশীল করে তুললেন।

ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কনস্টান্টিনোপলের মনীষীদের সাদরে অধ্যাপক পদে বরণ করে নিল। গ্রীক ভাষার চর্চা পশ্চিম ইউরোপে বিশেষ ছিল না। তাই পণ্ডিতগণ গ্রীক গ্রন্থগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন।

নবজাগরণের যুগের বৈশিষ্ট্য ঃ নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয়গণ অনুসন্ধিৎসু ও যুক্তিবাদী হয়ে উঠতে থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানুষ ছিল আবেগপ্রবণ ও অন্ধবিশ্বাসী। ধর্মতত্ত্ব, প্রচলিত রীতি-নীতি সব কিছুই তারা নির্বিবাদে মেনে নিত। ঐগুলির সত্যতা বা সার্থকতার বিষয়ে তারা চিন্তাই করত না। নবজাগরণের সময় হতেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে থাকে।

মানুষ যুক্তিবাদী হয়ে পড়ে। তারা রাজার স্বৈরাচারী শাসন নির্বিবাদে মেনে নিতে রাজী হলো না। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্‌ ও তাঁর পুত্র প্রথম চার্লস ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ এই মতবাদ গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। নানা কারণে প্রথম চার্লসের সঙ্গে ইংলণ্ডের জনসাধারণের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে এবং ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট প্রথম চার্লসকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে।

নবজাগরণের যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো **মানবতাবাদ**। অপার্থিব বিষয় নিয়ে চিন্তা না করে মানুষের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়ে তার মহত্বকে প্রতিষ্ঠা করার দিকে এই যুগের মানুষের বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। আর এর ফলে সাহিত্য ও শিল্পকর্ম হয়ে উঠে বাস্তবধর্মী।

বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কার ঃ দীর্ঘদিনের অন্ধবিশ্বাসের ফলে মানুষের কাছে যেসব প্রাকৃতিক ঘটনা দুর্বোধ্য এবং রহস্যময় মনে হতো, যুক্তিবাদী গবেষণার ফলে সেগুলি একে একে মানুষের বোধগম্য হয়ে উঠল। নবজাগরণের যুগে নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হতে লাগল। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ায় মানুষ অসীম মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির অবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করতে পারল। দিক্‌দর্শন যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ায় মহাসমুদ্রের বুকে নাবিকের পক্ষে সঠিক পথে জাহাজ চালান সম্ভব হলো। **ডায়াজ, ম্যাগেলান, ভাস্কো-ডা-গামা, কলম্বাস, ক্যাব্রাল, ড্রেক** প্রভৃতি অভিযাত্রীরা নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করতে লাগলেন। পৃথিবী যে গোলাকার, এ সত্যও মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত হলো।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ফলে শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, ইতিহাস, রাজনীতি, প্রভৃতি সব বিষয়ে মানুষের জানবার আগ্রহ বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। **চ্যসার, পেত্রার্ক, ম্যাকিয়াভেলির** ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চা, **লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল** প্রভৃতি মনীষীর শিল্পচর্চা, **কোপার-নিকাস**-এর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, মুদ্রণশিল্পের জন্য **গুটেনবার্গের**

টাইপ আবিষ্কার, পুরানো সাহিত্যগুলির উদ্ধার ও নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারকে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের দান বলা যায়।

ইতালিতে রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয়েছিল সত্য কিন্তু তার প্রভাব ফ্রান্স, ইংলণ্ড, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সের মনটেইন, রেবেলেয়াস ; ইংল্যাণ্ডের চ্যসার, ম্যালোরি, টমাস, মোর, মার্লো, সেক্সপীয়র ; স্পেনের সার্ভোণ্টিস, পর্তুগালের ক্যামেওনস প্রমুখ মনীষীগণ নবজাগরণের যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা : মধ্যযুগের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করা এবং রোমান চার্চের ধর্মীয় ঐক্যের আদর্শ মেনে চলা। মধ্যযুগের শেষদিকে সম্রাট ও পোপের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে এই আদর্শের পরিবর্তে রাজশক্তির কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ফলস্বরূপ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রসমূহের বিকাশ ঘটে। আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদী মনোভাব বলতে যা বুঝায় তা হয়ত সে যুগের মানুষের মধ্যে ছিল না। তবুও মোটামুটি-ভাবে সেই সময়কার রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে যেসব লোক বাস করত তাদের নিয়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়।

ইউরোপের আধিপত্য বিস্তার : সুপ্রাচীন কাল থেকেই ইউরোপীয় জাতিগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে যাতায়াত করত। মধ্যযুগের শেষে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গেও ইউরোপীয়দের পরিচয় ঘটে। ঐসব দেশের অজ্ঞ ও অনগ্রসর মানুষের উপর ইউরোপীয়রা তাঁদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অনতিকাল মধ্যেই উত্তর আমেরিকায় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের, দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেন ও পর্তুগালের এবং আফ্রিকায়, ইংল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, ইতালি,

বেলজিয়াম ইত্যাদি প্রায় সকল দেশের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষ ও চীন দেশেও ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য রাষ্ট্রের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের জাতিগুলি নিজ নিজ ভৌগোলিক সীমার বাইরে বিশাল ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

পুরানো ও নতুন রীতির সংঘাত ঃ নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তার ফলে ইউরোপীয় সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত পুরানো ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে তার পরিবর্তে এগুলিকে নতুনভাবে গড়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এযুগের মানুষ নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর আস্থা স্থাপন করতে শেখে, চার্চ বা রাষ্ট্রশক্তির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ না করে মানুষ নিজের চেষ্টায় স্বীয় অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অধিকতর মনোযোগী হয়। এর ফলে শুরু হয় রিফরমেশান বা **ধর্ম আন্দোলন** এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় প্রজাদের প্রতিনিধিত্বের সংগ্রাম। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন বাণিজ্য-নীতি অনুসৃত হওয়ায় পুরানো বাণিজ্য-ব্যবস্থা অচল হয়ে যায়।

মধ্যযুগের অবসান ঃ পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে ইউরোপের ইতিহাসের ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানুষের মন থেকে পুরানো চিন্তাধারা একেবারে মুছে গেছে, তার পরিবর্তে নতুনের আবির্ভাব দেখা দিয়েছে। ইউরোপের রাষ্ট্রনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনের লক্ষণ সূচিত হয়।

অপরপক্ষে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের ফলে মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হবার উপক্রম হয়। শেষে শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে সামন্ততন্ত্র চিরতরে বিলুপ্ত হয়। আধুনিক যুগের ধনতান্ত্রিক সমাজগঠনের দিকে এগিয়ে যায় মানুষ। এই ভাবেই উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে মানব সভ্যতার ইতিহাস মধ্যযুগের ইতিহাস তারই একটি অধ্যায়।

সমাপ্ত